৩

জগতের যত কিছু দেখেছি চাহিয়া
বুকে তাহে পড়েনি তো দাগ,
ফুল ফোটে পুনঃ ঝরে, কত জন্মে, কত মরে,
নীরবে আসিত যেত বসন্ত নিদাঘ।

৪

এক দিন শুভ্র শান্ত পবিত্র প্রভাতে,
ধীরে তুমি উরিলে আসিয়া,
সাধিনি ডাকিনি কভু, আপনা আপনি তবু
দিলে এ নীরস প্রাণে গঙ্গা বহাইয়া।

৫

চেয়ে দেখি অকস্মাৎ পূরব গগণে
দেখা দিল কনক তপন,
কোকিল পাপিয়া তারা, পুলকে আপনা হারা
গাহিছে উল্লাস গাথা মাতায়ে ভুবন।

৬

দেখিলাম নিরানন্দ আঁধার কাননে
হাসিতেছে বেলা গন্ধরাজ,
সমীরে সৌরভ ছুটি, উঠিছে গৌরব ফুটি,
ভূতলে নন্দন বন করিছে বিরাজ।

৭

দেখিলাম কুলু কুলু গাহিয়া তটিনী
ছুটিয়াছে স্যাগরের পানে,
তরঙ্গ আনন্দে ঢুলে, আছাড়ি পড়িছে কূলে
মাতিয়াছে সারা বিশ্ব মধুমাখা তানে।

৮

দেখি চেয়ে ম্লান বাসে আবরিয়া তনু,
চলিয়াছে অন্ধ পুষ্প নারী,
একেলা কুসুম বনে, যারে সে স্মরেছে মনে,
আনত আননে যেন ছটা আছে তারি।

৯

দেখিনু সে তপোবনে মুগ্ধা শকুন্তলা
বসি আছে কুটীরের দ্বারে,
প্রাণ তার নাই কাছে, প্রাণাধিক শুধু আছে,
সোণার স্বপন এক ঘিরিয়াছে তারে।

১০

দেখেনি সে মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত অনল
গরাসিতে আসিয়াছে তায়,
শুনেনি সে বজ্র শব্দ, যে ভয়ে ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ,
ধ্যানমগ্না প্রেমময়ী মহা সাধনায়।

১১

দেখিনু সে সুশ্যামলা সরসীর তীরে,
চন্দ্রাপীড় মীলিত নয়ন,
পদমূলে কাদম্বরী, আছে মৃত্যুঞ্জয়ে স্মরি,
করিছে সে মৃত দেহে অমৃত সিঞ্চন।

১২

দেখিনু সে, সুখময়ী যমুনা পুলিনে
বাল্‌[illegible]শ্বরী,
পায়ে দলি বিঘ্ন বাধা, ছুটিয়া আসিছে রাধা,
কুল মান গুরু-ভয় সকলি পাসরি।

১৩

সকলি লভিনু সেই চির শুভ ক্ষণে,
বসন্তের মলয় পবন;
বরষার শ্যাম ছটা, শারদ কৌমুদী ঘটা,
বিশ্বের আনন্দ, দয়া, পুণ্য, প্রয়োজন।

১৪

জানি না কেমনে তুমি এ শুষ্ক হৃদয়ে
সুরধুনী দিলে বহাইয়া,
প্রেমের পবিত্র দান, পবিত্র হইল প্রাণ
স্বর্গের বৈভব দিলে দরিদ্রে সাধিয়া।

১৫

শত যুগ যুগান্তর গেছে কোথা চলি,
আমি আছি সেই স্মৃতি লয়ে,
সেই বরণীয় দিন, মনে র'বে যত দিন,
থাকিতে পারিব বুঝি জগতের হয়ে।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

পরিবর্ত্তন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

সেই ষ্টীমারে বসিয়া বিনোদের মনে নানা কথা উদয় হইতে লাগিল, সেই শৈশবের সকল কথা, মায়ের সেই অতুল স্নেহ। বিনোদ কত আবদার কত অত্যাচার করিয়াছে, তবু তিনি সেই একই ভাবে তাহাকে ভালবাসিতেন। সেই তাহাদের ক্ষুদ্র মৃন্ময় গৃহ, সেই পরিষ্কার মৃত্তিকা-লেপিত অঙ্গন, অঙ্গনে সেই তুলসী বৃক্ষ, তুলসী বৃক্ষের সেই মৃন্ময় বেদী। প্রতি সন্ধ্যাকালে সে মায়ের সহিত প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া আসিত। কতবার দুষ্টামী করিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিত, মা তাহার চঞ্চলতায় বিরক্ত হইয়া, অঞ্চলে প্রদীপ ঢাকিয়া লইয়া যাইতেন। তাহার পর সেই সাশ্রুলোচনে দেবতার চরণে তাহার কল্যাণ কামনায় ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেন। সেই কতবার তাহার পীড়ার সময়ের মানত পয়সায় হরির লুট দিতেন, সেই গুড়ের বাতাসা কুড়াইয়া কত আমোদ হইত। সন্ধ্যাবেলা তাহার জননী প্রায় দাওয়ায় বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেন, বিনোদ কত কাড়াকাড়ি করিত, কত সুতা ছিঁড়িয়া দিত। সেই বাগানে কুলগাছে কত পাকা কুল, সেই সজিনা গাছে কত সজিনা, সেই গাছভরা পেয়ারা, সেই অঙ্গনে গোলাভরা ধান, চালে কত লাউ কুমড়া, তাহাদের ত কোন অভাব ছিল না, কখনও ভিক্ষা চাহিতে হয় নাই। সে কোন্ কুহকে পড়িয়া এতদিন মেদিনীপুরে পড়িয়াছিল, ভাবিয়া সে অবাক হইয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর দিন ষ্টীমার তাহাদের গ্রামের ঘাটে ভিড়িল। তখন সূর্য্য উঠিয়াছে, গ্রামের ঘাটে লোকজন স্নান করিতে আসিয়াছে, গ্রাম্য রমণীরা স্নানান্তে কলসী কক্ষে জল লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। ষ্টীমার দেখিয়া ঘাটের ছেলে মেয়ে যে যে অবস্থায় ছিল ছুটিয়া আসিয়া বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল, বড় বড় ঢেউ আসিয়া ঘাটে লাগিতে লাগিল, কেহবা অবাক হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। সকলে দেখিল, ষ্টীমার হইতে একটি যুবা ও একটি শিশুকন্যা-ক্রোড়ে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী অবতরণ করিল। তাহাদের সঙ্গে একটি ছোট পুঁটুলি, একখানি ছিন্ন মাদুর ও একটি ভাঙ্গা টিনের বাক্স রহিয়াছে; তাহারা গ্রামের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আর গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এক জন প্রবীণ ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা আপুনি কোথা হতে এয়েছ?"

বিনোদ বলিল, "আমি দেশে ফিরে এসেছি, আমি বিনোদ।"

প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন, "কোন বিনোদ গো, আমাদের মিত্তিরদের বিনোদ? যার মা সেই গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন?"

বিনোদ বলিল, "হাঁ আমি সেই মিত্তিরদের বিনোদ, আপনি আমাদের রাম কাকা বুঝি?"

রাম কাকা। হাঁ বাবা, আমি তোমাদের সেই পুরাণো রাম কাকা; সঙ্গে উনি বউমা বুঝি? তা এস বাছা এস, এত দিন কোথায় ছিলে? তোমাদের কালা দাদা তোমার ঘর দোর কি ক'রে সাজিয়ে রেখেছে, যক্ষীর মত সব আগ্‌লে বসে আছে। কালার মা বুড়ি রোজ পথ চেয়ে আছে। কালও সে আমায় শুধিয়েছিল, 'হাঁ গা রাম দাদা, বিনোদ আমার কি একখানও চিটি পত্তর লেখে না?' তৎপরে বৃদ্ধ সম্মুখের একটি বালককে বলিলেন, "নিতাই ছুটে যা, কালাকে ডেকে আন, ব'লে আয় মিত্তিরদের বিনোদ বাড়ী এয়েছে, বউ এসেছে, যা ছুটে যা।"

বালক বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ এত অপার আনন্দ যেন সহিতে পারিতেছে না, সেই শ্বশুরালয়ের পরাধীনতা, সেই কলিকাতার নিরাশা, তাহার হৃদয়কে শত ছিন্ন করিতেছিল, আজ সে স্বদেশে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল। এই বৃক্ষ শ্রেণী, এই পথ সকলি তাহার চিরপরিচিত। সে এত দিন কোন্ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল?

তাঁহারা অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল, এমন সময় পথেই তাহার কালা দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কালা বিনোদকে

দেখিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা ঠাকুর, এই যে আমার দাদাঠাকুর, পেন্নাম হই, এতদিন কোথায় ছিলে দাদা? তোমাদের ঘর যে আমি আগ্‌লে বসে আছি। ওই যে আমাদের সাতরাজার ধনটি, ও কি দাদা, তোমার খোকা? দাও বউমা, আমার কোলে দাও।"

বিনোদবিহারী কালার সেই আদর সম্ভাষণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল, "না কালা, ওটি আমার মেয়ে, ছেলেটি নেই—"

কালা। তা হোক দাদাঠাকুর, মেয়ে আর ছেলে কি? আজ যদি মা-ঠাকরুণ থাকতেন তাঁর কত আমোদ হ'ত। কত দুঃখে তিনি তোমায় মানুষ করেছেন তা আর কি বলবো দাদা, গ্রামের লোক সবাই তা জানে। সেই যে যখন তিনি ছিরিক্ষেত্তর গঙ্গাসাগরে যান, যাবার সময় কেঁদে কেঁদে আমায় বল্লেন, "কালা, এই ঘর দোর সব রইল, তুই আমার বড় ছেলে, বিনোদকে তুই পেলি, যদি আমি না ফিরি, বাছা তোদের হবে।" তার পর সবাই ফিরে এল, মা ঠাকরুণরে আর পেলাম না, বিনোদ দাদা আর এলো না। যাকে জিজ্ঞেস করি, সবাই বলে একজন বামুন বোধ হয় নিয়ে গেছে। আমি ত নাম জানি না, চিনি না, দাদা সেই পর্য্যন্ত আজ ক' বছর তোমার ভিটে আগ্‌লে বসে আছি। চল ঘরে চল, বুড়ী আজ আর আহ্লাদে বাঁচবে না।

বিনোদ সেই গ্রামবাসীদিগের সহিত আপনার গৃহ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। সেই চির পুরাতন অথচ চক্ষে নূতন আঙ্গিনা তাহার নিকট কি সুন্দর দেখাইল। আঙ্গিনার পার্শ্বে একটার পরিবর্ত্তে দুইটা ধানের গোলা। সেই সুপরিস্কৃত তুলসী-বেদী সেই উজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণে ঝক ঝক করিতেছে। বিনোদ প্রবেশ করিবামাত্র পার্শ্বের রন্ধনশালা হইতে একটী বৃদ্ধা রমণী আসিয়া বিনোদের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমার বাপধন, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? বুড়ীকে একবারও মনে হয় নাই?" তাহার রোদন যেন আর থামে না, সহসা কালার ক্রোড়ে শিশু কন্যাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। বৃদ্ধার সেই শুভ্র আলুথালু কেশ দেখিয়া শৈল কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদ তখন বুড়ীর নিকট হইতে শৈলকে লইয়া বলিল, "বুড়ী মাসী, একটু দুধ যোগাড় করে একে খাওয়া, আজ এ কিছু খায় নাই।"

বুড়ী তখন সব ভুলিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া এক বাটী গরম দুধ লইয়া বাহিরে আসিয়া সুখদার হাতে দিল। সুখদা সেই রকে বসিয়া আপনার পুঁটুলিটী খুলিয়া একখানি ঝিনুক বাহির করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দিল।

সকলে চলিয়া যাইবার পর, বিনোদ অতি ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। সেই শয়ন-কক্ষ তেমনি আছে, তেমনি পরিষ্কার মৃত্তিকা-লেপিত। সেই পুরাতন তক্তপোষ খানি রহিয়াছে। পার্শ্বে মায়ের সেই বৃহৎ কাঠের সিন্দুক। একটী কুলুঙ্গিতে একখানি ছিন্ন রামায়ণ, সেইখানি সময়ে সময়ে তাহার মা পড়িয়া তাহাকে শুনাইতেন। একটা কুলুঙ্গিতে তাহার ছেলেবেলার ভাঙা চোরা খেলিবার দ্রব্য পড়িয়া আছে, একটা বাঁশের ধনুক রহিয়াছে। তাহার মনে হইল, মা যেন নিকটে কোথায় আছেন, এখনি আসিয়া ডাকিবেন! সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় বসিল।

বুড়ী বিনোদের নিকট আসিয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিল, "উঠ বাবা, চল সেনান করে আসবে, মুখে একটু জল দেবে চল।"

বিনোদ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেই কথায় কাঁদিয়া ফেলিল। এতক্ষণ মায়ের জন্য তাহার অন্তঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছিল। সে কখনো এরূপ আশা করে নাই। সে কেন মার মৃত্যুর পর দেশে ফেরে নাই, কেবল তাহাই মনে হইতে লাগিল। কিসের আশায়, কিসের লোভে সে ঘর ছাড়িয়া পরাধীন ভাবে পড়িয়াছিল?

বিনোদকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বুড়ী ও কালা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সুখদা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল। শিশুকন্যা অবাক হইয়া একবার মায়ের প্রতি, একবার পিতার প্রতি চাহিতে লাগিল।

৪

বিনোদ স্নানাদি করিয়া আসিবার পর বুড়ী একটা

ছোট রিকাবীতে সামান্য মুড়ি ও একটু গুড় আনিয়া দিল, এক ঘটি জল আনিয়া দিল। বিনোদ অমৃতজ্ঞানে সেই জলপান ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। বুড়ী সুখদাকে জলযোগ করাইয়া, রন্ধনশালায় লইয়া গেল। সুখদা গিয়া দেখিল, রন্ধন করিবার উপকরণ প্রস্তুত, এক পাশে চাল ধুইয়া একটা ধুচুনিতে রাখা হইয়াছে, দুটো বেগুণ, কয়েকটা মূলা, কাঁচকলা ও শাক রহিয়াছে। মশলা বাটা হইয়াছে, উনান ধরান রহিয়াছে, দুইটা নূতন হাঁড়ি, একটা লোহার কড়া রহিয়াছে। সুখদা দেখিয়া আনন্দের সহিত বলিল, "কি রাঁধিব ?"

বুড়ী। তা তোমার যা ইচ্ছা বউমা, আজ পথের কষ্ট হয়েছে, একটু ঝোল ভাত রাঁধ, কালা মাছ আনতে গেছে, এল বলে।

সুখদা ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। বুড়ী একখানি বঁটি আনিয়া সেই তরকারীগুলি কুটিতে লাগিল, ও সুখদাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

বুড়ী। হাঁ বউমা, তোমার বাপের বাড়ী কোথায় বাছা ?

সুখী উনানে জাল ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "মেদিনীপুর।"

বুড়ী। বাপ মা সব সেখানে ?

সুখী। হাঁ।

বুড়ী। কটী ভাই বোন তোমরা ?

সুখদা। আমরা দুটি বোন ও তিনটি ভাই, ভাইয়েরা ছোট ছোট। দিদির কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, জামাই বাবু হাকিম।

বুড়ী সবিস্ময়ে বলিল, "হাকিম, মেজেষ্টার ? সে কোথাকার হাকিম বাছা ?"

সুখদা। তিনি বোধ হয় এখন বসিরহাটে কাজ করেন, আমারা গরীব মানুষ, তাঁদের খবর বড় একটা জানি না। দিদিকে ত আজ সাত আট বছর আমাদের এখানে পাঠান নি।

বুড়ী সে কথা ছাড়িয়া বলিল "হাঁ বউমা, মেদিনীপুর কি খুব বড় দেশ, পাড়াগাঁ নয় ?"

সুখী। এর চেয়ে বড় বোধ হয়।

বুড়ী। তোমার এ দেশ ভাল লাগবে, বউমা ?

সুখী। ভাল লাগবে বলেই ত এলাম, আমি সহরের চেয়ে পাড়াগাঁ ভালবাসি। সুখদা দেখিতে দেখিতে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল। শৈশব হইতে সে তাহার মায়ের সহিত রান্না বান্না করিত, এ বিষয়ে বেশ দক্ষতালাভ করিয়াছিল। বুড়ী তখন বিনোদের মায়ের জন্য কত আক্ষেপ করিতে লাগিল। কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এমন সময়ে কালা একটী ছোট পোনা মাছ হাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা, এই মাছ নাও বাছা, কত খুঁজে তবে আনলাম, বউমা আজ এসেছেন, মাছ না হলে কি হ'ত ?" বুড়ী তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া ধুইয়া আনিল। বিনোদের জন্য রন্ধনশালাতেই একখানি পিঁড়ি পাতিয়া ঠাঁই হইল। সুখদা অন্ন ব্যঞ্জন থালায় বাড়িয়াছিল, বাটীতে ঝোল দিল। বুড়ী সেই অবসরে একখানি ছোট থালা খুঁজিয়া আনিয়া বলিল, "বউমা, বিনোদ আমার এই থালায় ছোট বেলায় ভাত খাইত; খুকুমণিকে এতে ভাত দাও।"

বিনোদ সে দিন যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিল, জীবনে সেরূপ সুখে আহার আর সে কখনো করে নাই। সেই ক্ষুদ্র গৃহ তাহার, সে সেই গৃহে নিজের অন্ন খাইতেছে, এ সুখ কোথায় ছিল, সে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

স্বামী ও কন্যাকে আহার করাইয়া, বুড়ীর ভাত বাড়িয়া সুখদা নিজে আহার করিল। সেই গৃহের পার্শ্বেই কালা সপরিবারে বাস করে, সে আপন গৃহে চলিয়া গেল।

বিনোদ ও সুখদা আহারাদির পরে অপনাদের শয়ন-কক্ষে গিয়া বসিল। বিনোদ সুখদাকে বলিল, "সুখী, এ সব সুখ কেবল তোমার জন্য, আমি ত কখনো দেশে ফিরিবার কথা মনে করি নাই। অনেক সৌভাগ্যে তোমার মত স্ত্রী পেয়েছি"—সুখী সে কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ও সব কথা আর বল্‌তে হবে না, নিজের ভিটের কাছে কি কিছু আছে ? তোমার এত ছিল, তবু কেন মেদিনীপুরে পড়িয়া ছিলে ?" বিনোদ বলিল, "আমি কি কিছু জানিতাম ? মা যখন গঙ্গাসাগর যান তখন আমার বয়স হলেও আমি আমাদের জমি

জমার কথা কিছুই জানিতাম না, খেয়ে দেয়ে খেলা ক'রে বেড়াতাম। মা কালা দাদাকে জমি ভাগে দিয়েছিলেন, সে প্রতি বৎসর চাষ ক'রে আমাদের অর্দ্ধেক ধান দিত, আপনি অর্দ্ধেক নিত। মা সেই ধান কিছু রেখে, বাকি বিক্রি করে, না হয় ধার দিয়ে অন্য খরচ চালাইতেন। আজ পাঁচ বছরের ধান কালা দাদা জমা রেখেছে ও কিছু ধার দিয়েছে। কি রকম বিশ্বাসী দেখ, ওরা ত মনে কর্ত্তে পার্ত্ত আমি মরে গেছি, আর ফিরে আসব না, সবই ভোগ দখল কর্ত্তে পার্ত্ত। আমার মা ওদের দুঃসময়ে বড় উপকার করেছিলেন, কালার বাপ যখন মারা যায়, কালার মা তখন রুগ্ন কালাকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল, কেউ ঠাঁই দেয় নাই। বাবা আমাদের এই সামান্য আয়েই ওদের ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, মা ওকে ছেলের মত দেখতেন। তাই ওরা আমার মায়া কাটাতে পারে নাই। বুড়ী আমায় মানুষ করেছে, তাই কত ভালবাসে। বিদেশে আমায় কে জানিত? যখন মেদিনীপুরে থাকা অসহ্য হল, কতবার ভাবলাম দেশে চলে আসি, কিন্তু দেশে কি খাব, কে চাকরী দেবে এই ভেবে আসতে পারছিলাম না। আজ আমি দেশে ফিরে এসেছি, মনে হচ্ছে যেন আমার মায়ের কোলে ফিরে এসেছি।"

সুখদা বলিল, "তোমার মাকে দেখতে পেলাম না, এই বড় দুঃখ রইল, বুড়ী তোমার মায় কথা বলছিল আর কাঁদছিল।"

বিনোদ বলিল, "সুখী, আমার এই কুঁড়ে ঘর তোমার পছন্দ হবে ত? আমি ত তোমার বাবার হাকিম জামাইয়ের মত তোমায় সুখে রাখতে পারব না, আমি চাকর বামনও রাখতে পার্ব্ব না, গরিবের ঘর নিকিয়ে আর কাজ করে কি তোমার এ দেশ ভাল লাগবে?"

অভিমানে সুখদার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে বলিল, "শেষকালে সব সুখীর দোষ ত হবেই, আমি যেন গরিব বলে বড় দুঃখে আছি, কেবল তোমায় লাঞ্ছনা দিচ্ছি, কেমন?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তা নয়, আমার গরিবের ঘরে তুমি লক্ষ্মী এসেছ, তোমার জন্যই আমার সব, কেমন তা হলে হল?"

সুখদা খুকীকে ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত রহিল, সে কথার উত্তর দিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

আরতি অন্তে।

সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়ে গেছে,
নিভে গেছে দীপাবলি,
মন্দির হ'তে যেতেছে যাত্রী
আপনার গৃহে চলি'।
নিবিড় আঁধার ফিরিবার পথে
জনতা বিপুল চারি দিক হ'তে
মহা কল্লোলে ক্লান্ত পথিকে
যেতেছে সবলে ঠেলি,
সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়ে গেছে,
নিভে গেছে দীপাবলি।

যাত্রীর তায় ভ্রূক্ষেপ নাহি
কে আসে কে যায়, দেখে না সে চাহি,
অন্তর মাঝে দিব্য আলোক
উঠিয়াছে তার জলি'।
সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়ে গেছে,
নিভে গেছে দীপাবলি।

মঙ্গল ধূপ নিভেছে কখন
সে কথা গিয়াছে ভুলি,
বাজিছে তখনো কর্ণে তাহার
মঙ্গল হুলাহুলি।
চির জীবনের সঞ্চিত আশা
চির জীবনের যত ভালবাসা
চির আরাধ্য দেবতার পায়
দিয়াছে সে সব তুলি,
সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়ে গেছে,
নিভে গেছে দীপাবলি।

বিশ্ব আঁধার মহা কোলাহল,
তবু সে যাত্রী নহে চঞ্চল,
কল্লোল মাঝে শুনিছে নিয়ত
গুঞ্জন করে অলি।
সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়ে গেছে,
নিভে গেছে দীপাবলি।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু।

মৃত্যু জীবের নিকট অতি ভয়ানক পদার্থ। এই নামেই যেন শত অমঙ্গল ও আশঙ্কায় প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের উপর দিয়া মৃত্যু অবিরাম খরস্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। মরিবার জন্য জন্ম ও জন্মিবার জন্য মরণ! ইহার অন্তরালে বিশ্বনিয়ন্তার কি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে তাহা কে জানে?

মনীষিগণ বলেন, এই জগত কর্ম্মক্ষেত্র, ইহাতে যাতায়াত কেবল কার্য্য করিবার জন্য। সাধারণ চক্ষে কিন্তু দেখা যায়, যে অনেক স্থলে মানুষকে কর্ম্ম প্রারম্ভের পূর্ব্বেই ভগবানের আদেশে এই মর্ত্ত্যরাজ্য হইতে বিদায় লইতে হয়। জীবনের অসম্পূর্ণ আশা, উদ্যম, উৎসাহ সকলি জাগতিক ভাবে অপূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে তাহারা হাহাকারে এই অসম্পূর্ণতার ভাব প্রকাশ করে। জীবন ও মৃত্যুরহস্য দুরধিগম্য।

এই জন্ম ও মরণ জগত সংসারের মূল চক্র এবং মনুষ্য জীবনের সুখ দুঃখের আধার হইয়া আনন্দ ও বিষাদের দুয়ার খুলিয়া দিতেছে, তথাপি জন্ম অপেক্ষা মরণের আধিপত্য ও প্রভুত্ব আমরা অধিক পরিমাণে অনুভব করি।

মৃত্যুর কঠিন আদেশে আমাদের হৃদয়ের শত সহস্র বন্ধন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তখন প্রাণ উন্মত্তের ন্যায় কোথায় আদি, কোথায় অন্ত ও পরম তথ্য কি, জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

মৃত্যুর উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতের একটি আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি :—

যৎকালে কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সমরে কিশোর বয়স্ক তরুণ বীর অভিমন্যুকে সপ্তরথী অন্যায় সংগ্রামে নিহত করে, তখন নিদারুণ পুত্রশোকাতুর পাণ্ডবগণ সন্তাপদগ্ধ হৃদয়ে, শান্তি লাভার্থে দিবানিশি অনুচিকীর্ষু হইয়াছিলেন। একদা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ মৃত্যু কি, কোথা হইতে আসে, এবং কি প্রকারে মনুষ্যগণকে ইহলোক হইতে লইয়া যায়? ইহা শুনিয়া সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ, শ্রবণ করুন :—

"রাজা অকম্পন পুত্রশোকে নিরতিশয় অধৈর্য্য হইয়া উঠিলে নারদ ঋষি তাঁহাকে এই ইতিহাস শুনাইয়াছিলেন। 'মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টিকালে ক্রমান্বয়ে প্রজা সৃষ্টি করিয়া করিয়া পৃথিবীকে নিতান্ত পরিপূর্ণা দেখিয়া সংহার চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতে উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। বিফলমনোরথ হওয়াতে তাঁহার ক্রোধে আকাশ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। এবং সেই অগ্নি দ্বারা ভূমি, আকাশ, পৃথিবী, সমুদয় চরাচর দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাদেব আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে প্রভু, এত যত্ন করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলে, আবার স্বীয় ক্রোধানলে দগ্ধ করিতেছ দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে। অতএব হে ভগবান, প্রসন্ন হও। ব্রহ্মা কহিলেন, মহাদেব, আমারও প্রজা সংহার করিবার ইচ্ছা নাই, তুমি যাহা কহিতেছ তাহাই হইবে। পরন্তু জগতের হিতকামনায় আমার ক্রোধ হইয়াছে। এই বসুমতী পৃথিদেবী বর্দ্ধিত প্রজাভারে পীড়িত হইয়া সংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অনন্যোপায় হইলাম। রুদ্রদেব পুনরায় রক্ষা প্রার্থনা করিলেন, এবং ব্রহ্মা স্বীয় তেজ অন্তরাত্মাতে ধারণ করাতে তদীয় রোষাগ্নির উপসংহার দ্বারায় তাঁহার লোমকূপ হইতে কৃষ্ণ ও রক্তপিঙ্গলবর্ণ-শরীরা এক নারী উৎপন্ন হইল, সেই নারীকে ব্রহ্মা "মৃত্যু" নামে অভিহিত করিলেন, এবং তাহা দ্বারা সৃষ্টি বিনাশের বিধান করিলেন।

নারী রমণী-হৃদয় লইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং এই নিষ্ঠুর আদেশে সাতিশয় চিন্তাপূর্ব্বক সুস্বরে রোদন করিতে লাগিল। লোকপালক ব্রহ্মা দয়ার্দ্র হইয়া দুই হস্তে নারীর অশ্রু গ্রহণ করিলেন। সেই রমণী দলিতা লতার ন্যায় দুঃখার্ত্তা হইয়া করযোড়ে প্রজাপতিকে নিবেদন করিল, 'হে প্রজাপালক ব্রহ্মা, আমাকে ঈদৃশী নারী করিয়া কেন সৃজন করিলেন? আমি কি প্রকারে এরূপ অহিত ক্রূর কর্ম্ম করিব? যাহাদের পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয় বন্ধু বিনষ্ট হইবে তাহারা আমার অমঙ্গল প্রার্থনা করিবে, অভিশাপ দিবে। আমি যে তাহাদের ভয়ে ভীত হইতেছি! তাহারা যখন দীনভাবে রোদন করিবে তখন আমি কি বলিব? আমি কালান্তক যমের ভবনে গিয়া এরূপ কার্য্য করিতে অশক্ত। প্রজাসংহার কার্য্য হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন।' এই বলিয়া অবনত মস্তকে বিস্তর স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল। কিন্তু দৃঢ়চেতা ব্রহ্মা নারীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। নারী তথাপি দণ্ডায়মানা রহিলেন। অগত্যা ব্রহ্মা রমণীর প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। তখন মৃত্যু নাম্নী রমণী ধেনুকা আশ্রমে ও পরে অন্যান্য মহাতীর্থে গমন করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বিস্তর কঠোর তপস্যা করিলেন, তাহাতে প্রজাপতি হৃষ্টচিত্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি ভদ্রে, কি হেতু ঈদৃশ কঠিন তপশ্চারণা করিতেছ? তদুত্তরে রমণী বিনম্র বদনে কহিল, হে দেব, আমাকে প্রজাগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া যেন বিনাশ করিতে না হয়। তথাপি লোকপাল ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বাক্যের অন্যথা হইতে পারে না, তুমি ইহা পালন কর। ইহা সনাতন ধর্ম্ম। যম ও ব্যাধি তোমার সহায় হইবেন।

তাহাতে নারী আবার কহিল, যদি ঐ কার্য্য আমা ব্যতিরেকে না হয় তবে আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম, কিন্তু আমারও নিবেদন যেন অগ্রাহ্য না হয়। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ নির্লজ্জতা ও পরস্পরের প্রতি পরুষবাক্য, ইহারাও যেন প্রাণীগণের দেহ বিনাশের সহায় হয়। ব্রহ্মা কহিলেন, তথাস্তু, তুমি জীবগণকে পরলোকে আনয়ন কর, তোমার অশ্রু দেহজ ব্যাধি হইয়া মরণীয় প্রাণীগণকে বিনাশ করিবে, অতএব তোমার অধর্ম্ম হইবে না।

নারদ কহিলেন, সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ ও আসক্তি রহিত হইয়া অন্তকালে প্রাণীগণের প্রাণ হরণ করে। মৃত্যুকালে ব্যাধি হইয়া থাকে, ঐ ব্যাধি দ্বারায় জীবগণ ইহলীলা সম্বরণ করে, উহাই হেতু স্বরূপ। অতএব হে রাজন্ আপনি বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রাদি দেবতারা ও মনুষ্যের ন্যায় পরলোক গমন করেন। বরং মহা-বলবান ভয়ানক শব্দযুক্ত সর্ব্বব্যাপী অনন্ত-তেজা অসাধারণ বায়ুই ভীষণ উগ্ররূপে প্রাণীদিগের দেহ ভেদ করে। তাহার গতি প্রত্যাগতি নাই। অতএব আপনি পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনার পুত্র রমণীয় বীরলোকে গমন করিয়া নিত্যসুখ ভোগ করিতেছেন। কালে প্রজাগণের কাল উপস্থিত হইলে ঐ দেবদত্ত মৃত্যু তাহাদিগকে লইয়া যায়। প্রাণীগণ নিজেই নিজের নাশের মূল। দণ্ডপাণি যম নাশ করেন না। অতএব বীরগণ মৃত্যুকে বিধাতার সৃষ্ট নিশ্চয় জানিয়া শোকে বিচেতন হয়েন না।' নারদ ঋষি এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য শুনাইয়া অকম্পন রাজাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। অতএব হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির, তুমিও স্থিরচিত্ত হও, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তোমার পুত্র মহারথী অভিমন্যু সমরে বীরত্ব প্রদর্শন করতঃ ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না।" ইহার পর সঞ্জয় বহুবিধ পুণ্য কাহিনী পাণ্ডবরাজকে শ্রবণ করাইলেন। শ্বিত্যরাজ, বেণ বঙ্গিদেব এবং বহু রাজন্যবর্গ পবিত্র ও পুণ্যবান পুত্রগণের কাল প্রাপ্তি ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

মৃত্যুধর্ম্মশীল জগতের ক্রোড়ে মরণের অভিনয় বহুরূপে প্রকটিত। সংসার-কাননে বিবিধ পুষ্পের বিবিধ প্রকার সৌরভের ন্যায় তাহাদের উত্থান এবং পতনও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কোনটি মুকুলে, কোনটি অর্দ্ধ বিকশিত অবস্থায়, আবার কোনটি সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া জগতবাসীকে সুবাসে বিমোহিত করিয়া দেবতার

পদে উৎসর্গিত হয়, কিন্তু যে সুকুমার কুসুম অকস্মাৎ প্রবল তুফানে এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে উড়িয়া যায়, তাহার সৌরভ স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ভিন্ন কেহই পায় না। মর্ত্তে তাহার কেবল বিকাশমাত্র!

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

কোহেবালের কামিনী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

কবিরা কহিয়াছেন, পশুর মধ্যে শৃগাল, পক্ষীর মধ্যে বায়স এবং মানুষের মধ্যে নাপিতগণ অতিশয় ধূর্ত্ত। আমার বিবেচনায় ক্ষৌরকারেরা কেবল ধূর্ত্ত নহে, ইহাদের এক একজন, গ্রামের, নগরের ও উপনগরের এক একটী "গমনশীল সংবাদ পত্র" (Moving newspaper) স্বরূপ। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, তুরস্ক, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সমুদয় দেশে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, কি কি নূতন ঘটনা ঘটিল, কাহার জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ হইয়াছে, কোন্ বড় লোকের বিপদ বা সম্পদ হইয়াছে, পাড়ার অবস্থার কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইত্যাদি সমাচার সর্ব্বত্র নাপিতদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বিলাতের প্রামাণিকেরা রাজনীতি পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী নাপিতও এবিষয়ে কম নহে। ক্ষৌরকারেরা ভূপতির গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করে; নাপিতানীরা অন্তঃপুরেও যায়; তদ্ভিন্ন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ, পূজা পর্ব্ব প্রভৃতিতে নাপিতের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই জন্য নাপিতগণ যেন "গমনশীল সংবাদ পত্র," যেন সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সকল বিধ সমাচার বহন করিবার উপযুক্ত। আফগানিস্থানে নাপিতেরা অন্যান্য দেশের ক্ষৌরকারের ন্যায় ধূর্ত্ত বা সংবাদবাহক নহে; কোহেবালের কামিনীগণ স্বভাবতঃ এরূপ অনুসন্ধানপ্রিয়া এবং এরূপ আশ্চর্য্য প্রকারের সংবাদ-বাহিকা, যে তথাকার এক একজন স্ত্রীলোক এক এক শত নাপিতের অপেক্ষাও অধিকতর সংবাদ রাখে এবং কেবল সংবাদ রাখে তাহা নহে, পরন্তু এক একজন যেন রয়টার সাহেবের "তার আফিসের" এজেন্ট। পাড়ায় কে নূতন লোক আসিয়াছে, কোন বিদেশী আসিয়াছে, তাহার নাম ও ধাম কি, বিদেশীর চেহারাটা কেমন, সে করে কি, খায় কি, কাহার গরু চুরি গিয়াছে, কে মরিয়াছে, কাহার রোগ, শোক, মৃত্যু, বিবাহ বা বিপদ হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সে দেশে সম্প্রতি কি কি নূতন সমাচার আসিয়াছে, শস্যের ও অপরাপর দ্রব্যের মূল্য কত, কোন্ দেশে কি নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, ইত্যাদি বহু প্রকারের সংবাদ তথাকার স্ত্রী-সমাজ হইতেই পাওয়া যায়; নাপিতের নিকটে কিছুই শুনা যায় না। স্ত্রীলোকদের বৈঠক যেন সাক্ষাৎ পার্লামেণ্ট মহাসভা অথবা বড় বড় খবরের কাগজের আফিস!! পাড়ার মধ্যে নূতন লোক বা বিদেশী লোক আসিলে স্ত্রীলোকেরা তাহার "ভাতের হাঁড়ির খবর" পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অণুপরমাণুর অনুসন্ধান না লয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়ে না, অথচ কোহেবালের কামিনী সম্পূর্ণভাবে পর্দ্দানশিনী অর্থাৎ অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধা। এমন অনুসন্ধানপ্রিয়া রমণী পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

কাবুলের স্ত্রীলোকের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত খুব ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহাদের মস্তকের কেশের একটা অসাধারণত্ব আছে। এই বিশেষত্ব টুকু অন্য দেশের মহিলার মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। আমি পৃথিবীর অনেক দেশ প্রদেশ পরিব্রজন করিয়াছি, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাবা দ্বীপের স্ত্রীলোকের কেশ পৃথিবীর সমুদয় দেশের মহিলার মাথার কেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম। তাহার পরে জাপান ও মিশর, তন্নিয়ে তুরস্ক ও ত্রিবাঙ্কুড়। ভারতবর্ষের ইউরেশিয়ান রমণীর চুল উৎকৃষ্ট। আমেরিকা ও ইউরোপের স্ত্রীলোকের কেশ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে গণ্য, কিন্তু কাবুলের রমণী এবিষয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পরাস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এক একজন স্ত্রীলোকের কেশের সৌন্দর্য্য, দীর্ঘতা, চাকচিক্য, কোমলতা, পারিপাট্য প্রভৃতি দেখিলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। প্রায় সমুদয় স্ত্রীলোকেরই কেশ এইরূপ। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছিলাম, ইহারা অপক্ক

(কাঁচা) আঙ্গুরের রস, দাড়িম্ব বা বেদানার রস এবং অধিক পরিমাণে লেবুর রস দিয়া চুল পরিষ্কার করে। সাবান ইহাদের সমাজে ব্যবহৃত হয় না। চুল অত্যন্ত মলিন হইলে "বেশন" (অথবা ব্যাশন) দ্বারা তাহা পরিষ্কার করা হয়। আটা বা ময়দা হইতে বেশন প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদভাবে মসুর ডালের চূর্ণ মাখাইয়া কেশ ধৌত করা হয়। কোহেবালের কামিনীগণ তাহাদের কেশে বাদামের তৈল ব্যবহার করে; সর্ষপ, তিল, নারিকেল বা বিলাতী তৈল ব্যবহার করে না। এদেশের স্ত্রীলোকের মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) দেখা যায় না। কাবুলের স্ত্রীলোকের কেশের এই অসাধারণত্ব অন্য দেশে নাই।

কবিরা আরও কহেন, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" কবিরা একথা মন্দ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আফগানিস্থানের স্ত্রীসমাজ সম্বন্ধে এই প্রবাদ কখন মন্দভাবে ব্যবহার করা যায় না। বাঙ্গালী রমণীর প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধিটা কেবল গল্পে, কথায়, উপন্যাসে, স্বামী বা পিতার উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয়ে, উপন্যাস পাঠে অথবা পাড়াগেঁয়ে গল্পগুজবে বেশ পরিপক্ক দেখা যায়, কিন্তু কোহেবালের কামিনীকুলের প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় পাইলে পাঠক-পাঠিকারা বিস্মিত হইবেন। ইহারা অলঙ্কার, বেশভূষা, ধুম ধাম, সৌখীনতা, বিলাস প্রভৃতির ধার ধারে না; সে দেশে অসতী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বৃথা কাজে সময় কাটাইবারও তাহাদের প্রবৃত্তি নাই; অথচ তাহাদের বুদ্ধি এমন প্রলয়ঙ্করী, যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সে দেশে এমন বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা নাই, যে আবশ্যক হইলে লাঠি, ছুরি বা তরবারী চালাইতে না পারে। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে গমন করিতে রমণীগণ কুণ্ঠিতা নহে। দেশের স্বাধীনতা, জাতির স্বাধীনতা, স্বধর্ম্মের রক্ষা, প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ে তাহাদের বুদ্ধিকে প্রলয়ঙ্করী ভাবে দেখা যায়; ইতর কার্য্যে তাহাদের বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ভাবে দেখা দেয় না। পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় অবগত আছেন, আফগানিস্থানের সহিত ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক স্থাপন হইবার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল হইতে বৃটিশ জাতি তথায় এক জন ইউরোপীয় "রেসিডেণ্ট" (দূত) রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কখন কৃতকার্য্য হয়েন নাই। অবশেষে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড অকলণ্ডের শাসনকালে আমীর বাহাদুরকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া, অনেক প্রকারের সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া, সার পিটর লম্‌সডেন্ সাহেবকে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং সার লুই কাভাগ্‌নেরী সাহেবকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া কাবুলে প্রেরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, বাহান্ন জন পাঠান (কাবুলী) এবং একশত তিরাশী জন কাবুলে কামিনী সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দিনের বেলায় সাহেবদের কুঠি আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে কুঠি হইতে বহির্দ্দেশের ময়দানে টানিয়া আনিয়া নিহত করে। এই ঘটনা উপলক্ষে কাবুলের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মহা যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, যুদ্ধের অবসানে যখন ইংরেজেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সাহেবেরা তোমাদের দেশের স্ত্রী-জাতির প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই, তবে স্ত্রীলোকগণ সশস্ত্র হইয়া কেন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল ?" শুনা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে রমণীগণ কহিয়াছিলেন, "আমাদের দেশের লোকের অনিচ্ছায় রেসিডেণ্ট রাখা হইয়াছিল, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার ইংরাজের অধিকার নাই।" কি আশ্চর্য্য স্বাধীনতা-প্রিয়তা! কি আশ্চর্য্য সাহস এবং স্বদেশহিতৈষিতা!! রুশিয়া ও তুরস্কে যখন ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তখন তুরস্কের মুসলমান সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য আফগানিস্থানের অনেক রমণী পরিশ্রম সহকারে নানাবিধ যুদ্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিত; রুশের এক প্রবল পরাক্রমী সৈনাধ্যক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া ঐ সকল স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেন। ছিয়াত্তর জন রমণী বন্দী হইয়া সেনাপতির শিবিরে প্রেরিতা হয়। কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে, সৈন্যাধ্যক্ষ কহিয়া পাঠাইলেন, "এই সকল রমণী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে যদি এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে তাহারা অতঃপর আর কখন এরূপ কার্য্য করিবে না, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা

করিব এবং মুক্তি দিব।" স্ত্রীলোকেরা তাহাতে সম্মতা হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরে উপনীতা হইল। তখন তিনজন মাত্র শাণিত তরবারধারী প্রহরী শিবিরে পাহারা দিতেছিল। চেয়ারে উপবেশন করিয়া সেনাপতি কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে রমণীগণ অতি গোপনে কাপড়ের দ্বারা প্রহরীগণের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে অপদার্থ করিয়া রাখিল এবং অকস্মাৎ সৈনাধ্যক্ষের পার্শ্বস্থিত তরবারী উঠাইয়া লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। রমণীগণ চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, "ইহারই নাম ক্ষমা, ইহারই নাম ক্ষমা।" কেবল তাহাই নহে, অতি অল্পক্ষণ মধ্যে মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বত্র ইহা জানাইয়া দিল যে, "সেনাধ্যক্ষ আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।" সেনাপতির নিধন সমাচার প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীলোকগণ শত্রু শিবির হইতে এমন অদৃশ্যা হইয়া গেল যে তাহাদের আর কোন সমাচার পাওয়া গেল না। কোহেবালের কামিনীগণের বুদ্ধি এইরূপ প্রলয়ঙ্করী!

দুঃখের বিষয়, আমি এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে একটা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। আমি আফ্রিদী জাতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা আফ্রিদি জাতি সম্বন্ধে না হইয়া "কাফির" জাতি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে। আফ্রিদিরা পূর্ব্বকাল হইতেই মুসলমান, কিন্তু কাফিরগণ প্রচীনযুগ হইতে হিন্দু, এই জন্য মুসলমানেরা ইহাদিগকে "কাফির" (অর্থাৎ বিধর্ম্মী বা অবিশ্বাসী) কহিয়া থাকে। কাবুলের উত্তর পূর্ব্বদিকে এই পর্ব্বতময় প্রদেশ অবস্থিত। ইহারা কৃষ্ণবর্ণের লোমে পোষাক প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিয়া থাকে, তজ্জন্য "সিয়া-পোশ" নামে অভিহিত হয়। সিয়া অর্থে কৃষ্ণ, পোশ অর্থে পরিহিত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাফির স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই। মুসলমানেরাও এখানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা এক প্রকার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল। কাফিরস্থানের সমুদয় লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, কাবুলের আমীর বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। এই ঘটনা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। "কাফিরগণ" যখন হিন্দু তখন "ম্লেচ্ছ সন্তানকে" বধ করা তাহাদের রমণীদিগের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। যে যত মুসলমান বধ করিতে পারিত, সমাজ মধ্যে সে তত "কুলীন" বলিয়া গণ্য ও মান্য হইত। যে চতুর্দ্দশ জন "ম্লেচ্ছ" নিহত করিতে পারিত, সে ব্যক্তি মহাকুলীন বলিয়া পরিগণিত হইত। অন্ততঃ তিনজন মুসলমান বধ করিতে না পারিলে "কাফির" কুমার বা কুমারীর বিবাহ হইত না। অধিক বয়স পর্য্যন্ত যদি মুসলমান বধে সুবিধা না ঘটিত তাহা হইলে অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিত স্ত্রীলোক অন্ততঃ তিনটা গাছকে "ম্লেচ্ছ" বোধ করিয়া কর্ত্তন করিতে বাধ্য হইত। তাহা হইলেই বুঝা গেল, আফগানিস্থানের সর্ব্বত্র শত্রুবধের বিশেষ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। পুরুষ ও রমণীগণ অস্ত্রশস্ত্র চালন বিদ্যায় বিশেষ পটু। এদেশের অধিকাংশ রমণী যে সকল গীত গাহে তাহা আমাদের দেশের অনেক লক্ষ্মী-শ্রীভ্রষ্টা মেয়েদের গানের ন্যায় টপ্পা, গজল, আমোদের গান বা প্রেম সংগীত নহে। কোহেবালের কামিনীর গান বীর ও রৌদ্র রসে পরিপূর্ণ। তাহা শ্রবণ করিলে শরীরস্থ ধমনীর রক্ত তীব্র বেগে ছুটিতে থাকে এবং দেহ ও মন জাতীয় উদ্দীপনায় সতেজ হইতে থাকে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চা খায়, কিন্তু কেহ কেহ তামাকুর ধূম্রপানে অভ্যস্ত থাকিলেও সমগ্র নারী-সমাজে তামাকুর সেবা চলে না। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতি যদি "কুলটা" বলিয়া ধৃতা ও প্রমাণিতা হয়, তাহা হইলে তাহার মাথার কেশ কাটিয়া গালে চূণ কালি মাখায়, গলায় জুতার মালা পরাইয়া তাহাকে গাধার উপর চড়াইয়া নগরের বড় বড় বাজার ও রাস্তার চারি ধারে ঘুরাণ হইয়া থাকে, কিন্তু যে পুরুষ ইহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, সে ব্যক্তি ধৃত ও অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইলে স্ত্রীলোকের স্বামী বা পিতা অথবা আত্মীয়ের হস্তে নিহত হইয়া থাকে। ইহাই রাজবিধি, কেহ কেহ প্রচুর অর্থ দিয়া প্রাণ বাঁচায়। (বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

নব নারী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

দেবলাদেবী।

দেবলাদেবী গুজরাটের রাজকুমারী, দুর্ভাগ্যের আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া দিল্লীর সম্রাট সুলতান আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে নীত হন। এখানে তিনি জ্যেষ্ঠ রাজকুমার খিজির খাঁর রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষপাতী হন, তাঁহাদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। খিজির খাঁর জননী এই বিবাহের বিরুদ্ধবাদিনী হইয়া এই বাল্য প্রণয়ের বীজ পুত্রের হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিবার মানসে তাঁহাদের পরস্পরের দর্শন লাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষীণধারা স্রোতস্বতী গন্তব্য পথে বাধা প্রাপ্ত হইলে কূলপরিপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। রাজকুমারের প্রত্যেক কার্য্যে এরূপ সুগভীর মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ পাইতে লাগিল, যে রাজমহিষীর অন্তঃকরণও অবশেষে দ্রবীভূত হইল; তিনি সে বিবাহে অনুমতি দান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই প্রেমিক প্রেমিকা দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজনীতির কুটিল চক্রের বিঘূর্ণনে খিজির খাঁ পিতৃহৃদয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার রোষাগ্নিতে প্রণয়িযুগলের সমস্ত সুখ শান্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রী মালিক কাফুরের চক্রান্তে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে খিজির খাঁ গোয়ালিয়ারের ভীষণ দুর্গে চিরবন্দী হইলেন। এই ভীষণ কারাগারেও দেবলাদেবী তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। এই দুর্ব্বহ অবস্থায় সাধ্বী প্রণয়িণীর সপ্রেম সেবাশুশ্রূষাই খিজিরের একমাত্র সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন ইহলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ তনয় মন্ত্রী মালিক কাফুরের সহায়তায় পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মালিক কাফুর আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ রাজকুমার খিজির খাঁর দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই আলাউদ্দীনের ক্রীতদাস ও শরীর-রক্ষকগণ মালিক কাফুরকে হত্যা করিয়া সম্রাটের চতুর্থ পুত্র কুতবউদ্দীনকে রাজসিংহাসন প্রদান করিল। ইন্দ্রিয়পরবশ কুতব রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেবলাদেবীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। সাধ্বী রমণীর নির্ম্মল চরিত্র তাঁহার পাপলালসা সংযত করিতে পারে নাই। কুতব আপনার পাপাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দেবলাদেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। খিজির খাঁর বদনমণ্ডল ক্রোধে ও ক্ষোভে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি অবজ্ঞা ভরে ভৎর্সনাপূর্ণ উত্তর দিয়া রাজদূতকে বিদায় করিয়া দিলেন। কুতব আপনার পাপ সংকল্পে ব্যর্থকাম হইয়া রোষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাদী নামধেয় জনৈক দুরাত্মাকে গোয়ালিয়ারের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। সাদী তথায় উপনীত হইয়া খিজির খাঁকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। নরঘাতকের খড়্গ উত্থিত হইলে পতিপ্রাণা দেবলাদেবী ব্যাকুল হৃদয়ে আপনার সমস্ত শক্তি ঘনীভূত করিয়া খিজিরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু হায়! প্রেমদীপ্ত সতীর প্রেম সেই পাষাণহৃদয় নির্ম্মম নরহন্তাকে দ্রবীভূত করিতে পারিল না। তাহার অসি সঞ্চালনে দেবীর হস্ত দ্বয় ছিন্ন ও বদনমণ্ডল ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল, তাহার পর খিজির খাঁর ছিন্ন মুণ্ড ভূতল চুম্বন করিয়া রক্ত ধারায় পৃথিবী কলঙ্কিত করিল।

(৪)

মীরাবাই।

মীরাবাই একজন "অতুলনা ভারত-ললনা।" মীরা রাঠোর বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন ও চিতোরের অধিপতি রাণা কুম্ভের সহিত পরিণীতা হন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ তাঁহার আবির্ভাব কাল। মীরা রূপসীকুলরাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এই অপরূপ রূপরাশি তাঁহার অমরত্বের কারণ নহে; মীরার অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ ও ভগবদ্ভক্তিই তাঁহাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে। রাণা কুম্ভ কাব্য রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচনা ভাবের প্রাচুর্য্যে ও ভাষার সৌন্দর্য্যে অতি রমণীয় ছিল।

মীরারও কবিত্ব শক্তি ছিল। বঙ্গীয় কাব্য-কাননের কোকিল জয়দেব মীরার সমসাময়িক ছিলেন। রাজপুতানার ধর্ম্মপ্রাণ রাজদম্পতি সর্ব্বদা জয়দেবের কোমল-কান্ত পদাবলী পাঠ করিতেন। রাণা কুম্ভ গীতগোবিন্দের উত্তর ভাগ লইয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মীরাবাইও অসংখ্য কবিতার রচয়িত্রী। তদীয় উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে এই সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সুমধুর পদাবলী পাঠে আজও অনেক ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয়। মীরাবাই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ ক্ষেত্র পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি কোমলপ্রাণা অবলা হইয়া ভগবদ্ভক্তির বলে পথের সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম সহ্য করিতেন। বস্তুতঃ ভ্রমণোপলক্ষে তাঁহার চরিত্রে পুরুষোচিত সাহস, উৎসাহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা পরিদৃষ্ট হইত। তীর্থক্ষেত্রে মীরার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে ভগবদ্ভক্তি শত মুখে ফুটিয়া বাহির হইত; তন্মূলক নানা অনুষ্ঠানে চারি দিক উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিত। এই সকল অনুষ্ঠান কালে মীরার অসাধারণ ভাবোন্মত্ততা দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইত।

(৫)

তারাবাই।

রাজপুত বীর-গাথা বীর্য্যবান্ পৃথ্বীরাজ ও বীরবালা তারার কীর্ত্তি কলাপে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রায়সুরতন নামক এক জন সত্যসংকল্প রাজপুত বীর বেদনোরের সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি চিরবিখ্যাত সোলাঙ্কি বংশ-সম্ভূত ছিলেন। বেদনোরের সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি মধ্যভারতের অন্তর্গত তঙ্কটোডার অধিপতি ছিলেন। গিল্লা নামক একজন আফগান সেনাপতি তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া তঙ্কটোডা অধিকার করেন। সুরতন স্বরাজ্যচ্যুত হইয়া মিবারের অন্তর্গত আরাবলীর পাদদেশ-স্থিত বেদনোরে আসিয়া বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হন। চিতোরের রাণা রায়মল্ল সুরতনকে বেদনোরের সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রায় সুরতনের কন্যার নাম তারাবাই। তারা বাল্যকাল হইতেই অশ্ব-চালনা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। যে সময় তারা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, তখন রায়সুরতন টোডার উদ্ধার সাধন জন্য সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেন। বীরবালা তারাবাই যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাজপুত সৈন্য বিপুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই প্রত্যাবর্ত্তনকালে অশ্বা-রোহিনী সৌন্দর্য্য-লীলাময়ী তারাবাই চিতোরের তৃতীয় রাজকুমার জয়মল্লের দৃষ্টিপথে পতিত হন। সে অতুল রূপরাশির প্রথম দর্শনেই জয়মল্ল একবারে বিমোহিত হইয়া পড়েন; তিনি তারার পাণিপ্রার্থী হন। রায়-সুরতন উত্তর করিলেন, টোডার উদ্ধার সাধন কর, তারা তোমার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবে। জয়মল্ল এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া টোডার উদ্ধার সাধন জন্য সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু শত্রু-হস্তে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারার তরঙ্গিত রূপরাশি তাঁহাকে একবারে বিমোহিত করিয়াছিল, এজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াও তারাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য বল প্রকাশে উদ্যত হইলেন। রায়সুরতন এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়মল্লকে হত্যা করিলেন।

জয়মল্লের হত্যা সংবাদ যথাসময়ে রাণা রায়-মল্লের কর্ণগোচর হইল। তিনি ধীরভাবে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকুমার সোলাঙ্কি বংশের চিরোজ্জ্বল নামে কলঙ্ক অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া আপনার দুষ্কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি লোকাতীত মহাপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়া অপরাধী পুত্রের হত্যাকারী সুরতনকে তাঁহার তেজস্বিতা ও সৎসাহসের জন্য পুরস্কৃত করিলেন। চিতো-রের চতুর্থ রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রায়সুরতন ও তদীয় বীরবালার অসাধারণ তেজস্বিতা দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন এবং সেই রমণী-রত্নের অভিলাষী হইয়া শত্রুহস্ত হইতে টোডা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিলেন। পৃথ্বীরাজ শৌর্য্যবীর্য্যের আধার ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের বিষয় তারাবাই সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। একারণ তিনি







ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারী ত্রয়।

তাঁহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক টোডার উদ্ধার সাধনকল্পে পৃথ্বীরাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা পাঁচ শত রাজপুত সৈন্য সহকারে টোডার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ শত্রু-পুরীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহরমের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, নগরবাসীরা উৎসবে মত্ত হইয়া অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। কৌশলী বীর সেনাদল দুর্গের বাহিরে রাখিয়া মাত্র বীরবালা তারাবাই ও আপনার চিরসহচর সেনগড়ের সামন্তকে সঙ্গে লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তার পর রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উৎসব-রত জনসঙ্ঘের সহিত মিশিয়া গেলেন। এই সময় আফগান-অধিপতি উৎসবে যোগ দিবার জন্য প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি জনসঙ্ঘ মধ্যে তিন জন অপরিচিত লোক দেখিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ তদীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের বর্ষা ও তারাবাইয়ের ধনুর্ব্বাণ তাঁহার ইহ লীলার শেষ করিয়া দিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে আফগানেরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজ এবং তদীয় সহচর ও সহচরী সেই অবসরে দুর্গের বহির্দ্বারের নিকট আগমন করিলেন। এই সময় এক বিপুলকায় হস্তী তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তারাবাই অসম সাহসে তরবারির আঘাতে হস্তীর শুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহারা নিরাপদে স্বসৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পরমুহূর্ত্তেই আফগানেরা তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাঁহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। অতঃপর বীরবালা তারাবাই বিজয়ী পৃথ্বীরাজের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়া বীরজায়া হইলেন। নবীন দম্পতি সুনির্ম্মল আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহাদের এই সুখের দিন অবসান হইল। শত্রুর বিষ প্রয়োগে পৃথ্বীরাজ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পতিগতপ্রাণা তারাবাই প্রাণপতিসহ জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য সংকল্প করিলেন। চিতা সজ্জিত হইল। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পূত চিতা আচ্ছাদন করিল—

"ভস্মসাৎ নরদেহ,—চিতানির্ব্বাপণ।
ধূলায় মিশিল ধূলা, জীবনে জীবন॥" (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারীত্রয়।

বর্ত্তমান সংখ্যা ভারতমহিলায় ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারী ত্রয়ের চিত্র প্রদত্ত হইল। ভারতবর্ষ এক দেশ হইলেও এখানে এত বিভিন্ন জাতির বাস, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও আচার ব্যবহারে এত পার্থক্য, যে বঙ্গদেশীয় নারীগণের সহিত ত্রিবাঙ্কুরের নারীগণের সাদৃশ্য অতি অল্প। বঙ্গমহিলাগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ, ত্রিবাঙ্কুরের মহিলাগণ মুক্তভাবে রাজপথে বিচরণ করেন। বঙ্গরমণী অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের সুন্দরীগণ অনাবৃত-বদনা। বঙ্গনারী পিতৃকুলের সম্পত্তিতে অনধিকারিণী, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরে রমণীগণই সকল প্রকার ভূমিসম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী, পুরুষগণের তাহাতে অধিকার নাই।

এই রাজকুমারীত্রয় বর্ত্তমান মহারাজার ভাগিনেয়ী। চিরপরম্পরাগত প্রথা অনুসারে ইঁহাদেরই জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন। কিন্তু বাহিরে নানা পার্থক্য থাকিলেও হিন্দুনারীর প্রাচীন আদর্শ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে বঙ্গনারী অপেক্ষা ত্রিবাঙ্কুর-মহিলাকেই সেই আদর্শের সমধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। ত্রিবাঙ্কুরে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে বর্ণিত হিন্দু আচার পদ্ধতির এখনও প্রবল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজকুমারী ত্রয়ের শিক্ষাদীক্ষা, বেশভূষা সকলই প্রাচীন প্রথানুযায়ী। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে বর্ণিত প্রাচীন রাজমহিলাগণের সহিত ইঁহাদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজকুমারীত্রয়ের বয়স যথাক্রমে ২৮, ২৪ ও ২২ বৎসর। অল্প বয়সেই ইঁহারা উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইঁহাদের মাতৃভাষা "মালয়ালম" শিক্ষা করেন। তৎপর ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সংগীত শাস্ত্র এবং গীতবাদ্যেও ইঁহারা প্রাচীন রাজমহিলাগণের ন্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল আপনারা সুশিক্ষা লাভ করিয়াই ইঁহারা পরিতৃপ্ত হন নাই। ত্রিবাঙ্কুরে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করে সে বিষয়েও ইঁহারা বিশেষ যত্নবতী। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পর্ব্বাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া ইঁহারা পুরস্কার বিতরণ করেন।

রাজকুমারীগণ এখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। এই সুশিক্ষিতা রাজকুমারীগণের দ্বারা ত্রিবাঙ্কুরের নারীবর্গের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

ইঁহার সাহিত্য জীবনের কথা অল্পাধিক বলা হইয়াছে; এখন সাংসারিক জীবনের কথা কিছু বলা উচিত। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগত হইয়াই ইঁহার অজস্র অর্থ ব্যয়ের অভ্যাস হয়। নিজ স্বাভাবিক উদারতা ও বদান্যতা এবং অভিভাবক-হীনতার জন্য তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন। এই জন্য ইঁহাকে বঙ্গকবি মাইকেলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, বা "এথেন্সের টাইমনের" মত "কাশীর টাইমন" বলা যাইতে পারে। এস্থলে বলা উচিত, ইঁহার অর্থ নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত, এবং ইঁহার মনে যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। অমিতব্যয়িতার জন্য আত্মীয়গণ অনেক উপদেশ দিতেন; কিন্তু ইনি সে উপদেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিলেন। ইনি সাতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন, এবং আজীবন নানারূপে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। যে দ্রব্য ইঁহার মনোনীত হইত তাহা যতই মহার্ঘ হউক না কেন, সংগ্রহ করিতেন। প্রাপ্তব্যবহার হইবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন। যখন আত্মীয়গণ দেখিলেন, ইঁহার কাছে যদি কুবেরের ভাণ্ডার থাকে তবে তাহাও ব্যয় হইয়া যাইবে, তখন অগত্যা অবশিষ্ট সম্পত্তি তিন ভাগ করা হইল; দুই ভাগ ইঁহাদের উভয় ভ্রাতার ও এক ভাগ ইঁহাদিগের বাটীতে স্থাপিত বিগ্রহের। যাহার সমস্ত সংসার আত্মীয় এবং যে সমস্ত সংসারের ধন ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার কাছে এই সামান্য সম্পত্তি কয়দিন থাকিবে? ক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে আরম্ভ করেন। কাশীর সুদখোর 'সাইলাক'দিগের মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইল। জনৈক মহাজন ইঁহাকে এক খানা বজরা ও অল্প টাকা দিয়া তিন হাজার টাকার 'হুণ্ডী' লিখাইয়া লয়েন, এবং ইনিই সর্ব্বপ্রথমে উক্ত টাকার জন্য ভারতেন্দুর উপর নালিশ করেন। আলীগড়ের সুপ্রসিদ্ধ মৃত সর সৈয়দ আহমদ তখন কাশীর সদর-আলা, তাঁহারই এজলাসে মোকদ্দমা হয়। সৈয়দ সাহেব উক্ত মহাজনকে তাঁহার যত মূলধন ছিল তাহারই ডিক্রী দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতেন্দু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যখন আমি জানিয়া বুঝিয়া হুণ্ডি লিখিয়া দিয়াছি, তখন আমাকে টাকা দিতেই হইবে, সামান্য অর্থের জন্য আমি নিজের ধর্ম্ম নষ্ট এবং সত্য ভঙ্গ করিতে চাই না।"

ইঁহার মাতামহের অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মাতামহী উভয় দৌহিত্রকে নিজের উত্তরাধিকারী করিয়া সম্পত্তি 'উইল' করিয়া দেন। কিন্তু ইঁহার যথেচ্ছা ব্যয়ের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না জানিয়া, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'দানপত্র' পরিবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত কনিষ্ঠ দৌহিত্র গোকুলচন্দ্রকে দান করেন। নিস্পৃহ ভারতেন্দু সম্পত্তি পাইয়াও সুখী হন নাই, এবং বঞ্চিত হইয়াও দুঃখিত হইলেন না। আনন্দিত হৃদয়ে নব দানপত্রে উপস্বত্ত ত্যাগের স্বীকারপত্র লিখিয়া দিলেন। সুমেরু তুল্য ধন থাকিলে যিনি তাহা অপরকে দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না, তিনি সামান্য ধন নিজ সহোদর ভ্রাতাকে দিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? এইরূপে হরিশ্চন্দ্র অল্পদিনেই 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের' ন্যায় ধনহীন হইয়া গেলেন। তথাপি ইঁহার অপরিমিতব্যয়িতা দূর হইল না। মরণকাল পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ঈশ্বরও যেন কোন না কোন রূপে এই উদার-হৃদয় দানবীরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে অর্থ যোগাইতেন।

যে সময় বিদ্যানুরাগী সর উলিয়ম মেওর এ প্রান্তের

শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন, তখন ভারতেন্দু হিন্দীকে রাজভাষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। হিন্দীতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ লিখিবার জন্য পুরস্কার দিবার নিয়ম হয়, কিন্তু তাহা পক্ষপাতশূন্য ছিল না। মিঃ কেম্পসন সাহেব তখন এ প্রান্তের শিক্ষা বিভাগের বড় কর্ত্তা। পূর্ব্ববর্ণিত রাজা শিবপ্রসাদ ইঁহার বড় কৃপাপাত্র ছিলেন। রাজা সাহেব পরশ্রীকাতর ছিলেন, নিজের সম্মুখে যে এক জন 'ছোঁড়ার' উন্নতি হয় তাহা উঁহার মোটে সহ্য হইল না। রাজা মহাশয় পারসী মিশ্রিত হিন্দী প্রচলিত করেন, আর ভারতেন্দু শুদ্ধ সাধু ভাষার সৃষ্টি করেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাধু ভাষার সমাদর হইল, তখন রাজা সাহেব "স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্ কামারের এক ঘা" এই প্রবাদ বাক্যানুরূপে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজের দিকে টানিলেন। ওদিকে নানারূপ অন্যায় দেখিয়া ভারতেন্দুও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি স্বভাবতঃ কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, সেই জন্য নিজপত্রে "পঞ্চ" (punch) লিখিয়া রাজপুরুষদিগের উপর কটাক্ষপাত করিতেন, এই কারণে রাজা সাহেবও ইঁহাকে গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন করিবার বেশ সুযোগ পাইলেন। ভারতেন্দুর "লেবী প্রাণ লেবি" নামে একটী লেখা প্রকাশিত হয়, উহার বর্ণনীয় বিষয় লাট সাহেবের "লেবী" দরবারে কৃষ্ণকায় ধনীদিগের দুর্দ্দশা। "মসিয়া" নামক আর একটী লেখা ছোটলাট স্যর উইলিয়ম মেওর মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া লেখা হয়। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট "কবি-বচন-সুধা"র যে একশত খানি ক্রয় করিতেন তাহা রহিত হইল। "হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকায়" "কবি হৃদয়-সুধাকর" নামক গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, 'উহা সুরুচি সঙ্গত নহে' এই অছিলায় চন্দ্রিকাও বন্ধ করা হইল। "বালা-বোধিনী" অনাবশ্যক বলিয়া বন্ধ করা হইল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদিগের কাছে ইনি রাজবিদ্রোহী বিবেচিত হইলেন। ইঁহার স্বাধীন ও উন্নত হৃদয় এ সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিল না, প্রথমে ইনি এ সকল বিষয়ে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগী হয়েন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়াতে রাজপুরুষদিগের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন। এতদিন রাজপুরুষদিগের মনস্তুষ্টি সাধন ও বিনা বেতনে বিচারক হইয়া "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে" গিয়া অনেক সময় নষ্ট হইত, এই সময় হইতে ঐ সকল বাজে কাজ ছাড়িয়া নিজ উদার উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর যত্নবান্ হইলেন। যাহারা ইঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের দ্বারা ইঁহার ও ইঁহার দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইল। রাজ্যকার্য্যে লিপ্ত থাকিলে কোন সময় "ভারত নক্ষত্র" (Star of India) হইতে পারিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে ইঁহাকে "ভারতেন্দু" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিত না। প্রকৃতি-পুঞ্জের অভাব অভিযোগ রাজ-কর্ণগোচর করিবার জন্য ইনি যাহা লিখিতেন অদৃষ্টগুণে তাহা বিদ্রোহ সূচক বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভারতেন্দু তাহা রাজভক্তির নিদর্শনই মনে করিতেন। ইঁহার কতকগুলি নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি পাঠ করিলে ইংরাজাধিকারে যে ভারতের কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ হয় নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য ইংরাজ শাসনে কোন ত্রুটি দেখিলে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশিত করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না এবং ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ সম্রাজ্যে বাস করিয়াও যে ভারতবাসীকে ন্যায় বিচারের জন্য লালায়িত হইতে হয়, তজ্জন্য আক্ষেপ করিতেন। ভারতেশ্বরীর সুখে হর্ষ ও শোকে দুঃখ প্রকাশ করিতে ইনি অগ্রণী ছিলেন। যখন রাজপরিবারে কেহ অসুস্থ হইতেন, তখনই তাঁহার আরোগ্য কামনায় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইত। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ বিচার করিয়া দেখুন, ইনি রাজভক্ত ছিলেন, না রাজদ্রোহী! (ক্রমশঃ)

প্রবাসিনী।

ঋগ্‌বেদের দেবতাগণ।

পঞ্চম প্রস্তাব।

ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্রের মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে;—

"এই ইন্দ্রের ভয়ে পর্ব্বত সকল নিশ্চল হইয়া স্ব স্ব

স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের ভয়ে স্বর্গ এবং পৃথিবী কম্পিত হয়। আর নোধা ঋষি অনেক সূক্ত দ্বারা সেই কমনীয় ইন্দ্রের দুঃখাপনায়ক রক্ষণী শক্তি পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করতঃ তৎকালে বীর্য্যবান হইয়াছিলেন।" (১।৬১।১৪)

অন্যত্র ঃ—"যে ইন্দ্র অভীষ্টদাতা ও বীর্য্যযুক্ত, এবং দ্যুলোক ও ভূলোকের সম্রাট, যিনি উদকদাতা, এবং সংগ্রামে আহ্বান-যোগ্য তিনি মরুদ্‌গণের সহিত আমাদের রক্ষণে তৎপর হউন। ১।১০০।১

স্থানান্তরে ঃ—"দেবগণ বা মনুষ্য বা জল সমূহ যে দেবের বলের অন্ত পায় নাই তিনি নিজ বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি মরুদ্‌গণের সহিত আমাদের রক্ষণে তৎপর হউন।" ১।১০০।১৫।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে ইন্দ্র অসাধারণ শক্তিশালী। কালক্রমে সকলে তাঁহাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তারূপে বিশ্বাস করিতে লাগিল। তিনি দেব ও মনুষ্যগণের নেতা, অপরিমিত বলশালী প্রভু, অধার্ম্মিকদের শাস্তিদাতা এবং সাধুদের রক্ষক। তিনি স্বর্গ, সূর্য্য, উষা এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। চন্দ্র তাঁহার দ্বারাই আকাশে স্থাপিত, তাঁহারই আদেশে সূর্য্য আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করেন। স্বর্গের আলোক তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট; পৃথিবীর নদী সকল তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং বিভক্ত। মনুষ্যের মনে সমস্ত সচ্চিন্তাই ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত। শস্য ক্ষেত্রে তাঁহার আদেশে শস্য হয়; কে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে ?

বৈদিক কবিগণ অনবরত তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহার শক্তি, দানশীলতা এবং জ্ঞান অতুলনীয়। বহু সংখ্যক সূক্ত তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

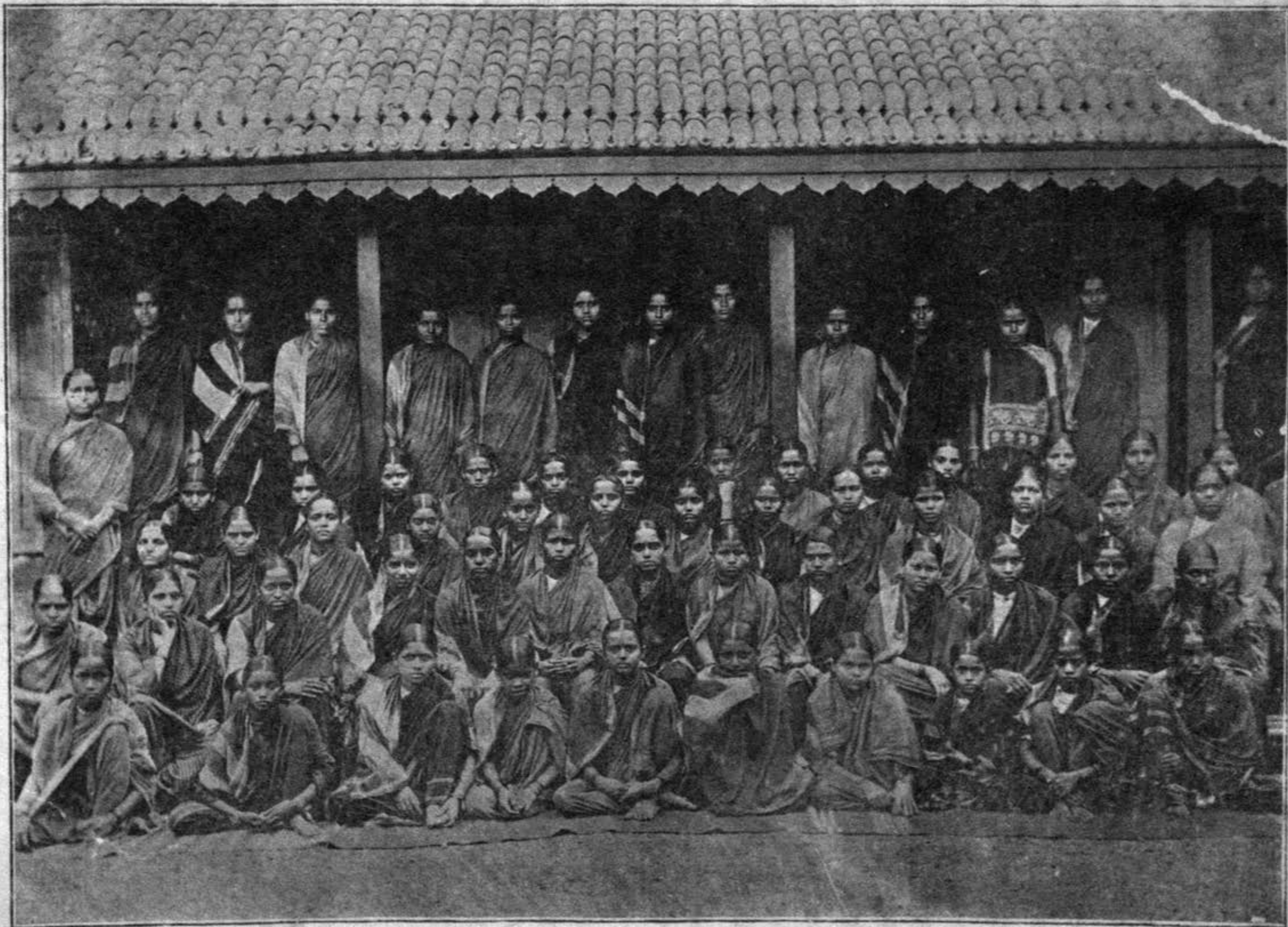
তিনি উদ্ধত ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, (স্বর্গীয় ও পার্থিব) উভয়বিধ ধনের অধিপতি, এই ইন্দ্র নিজ পরিচারকবর্গকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ আহ্বান করেন।

পাপীদিগকে তিনি শাস্তি দেন, যাঁহারা প্রতিজ্ঞা পালন করে না, যাঁহারা সত্যের অপলাপ করে, তাহাদিগকে তিনি প্রহার করেন। যে সকল ধনাঢ্য লোক তাঁহাকে সোম প্রদান করে না তাহাদিগকে তিনি ধ্বংস করেন, যাঁহারা অনিজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্য সোমযজ্ঞ সম্পাদন করে না তাহাদের বিনাশ অপরিহার্য্য। ইন্দ্র যাহাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হন তাহারা কোথাও নিরাপদ থাকিতে পারে না, বিপদের সময় ইন্দ্রের নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় না।

যখন ভয়ার্ত্ত লোক বলে—"অনেক লোক বলে ইন্দ্র নাই; কে তাঁহাকে দেখিয়াছে ? কেন আমরা তাঁহার উপাসনা করিব ?" ইন্দ্র তখন প্রাদুর্ভূত হন এবং অবিশ্বাসীকে বলেন, 'আমি আছি; এই আমাকে দেখ, আমি সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ। সোমযজ্ঞে আমার বিশেষ প্রীতি হয়, আমি ধার্ম্মিককে রক্ষা করি এবং পাপীকে বিনাশ করি।'

ইন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধ আর দীর্ঘ করিতে চাই না। ঋগ্বেদোল্লিখিত দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান, ইহা পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন। ইন্দ্র স্বর্গনিবাসী প্রধান দেব, বায়ু এবং মেঘের পরিচালক, বৃষ্টিদাতা, এবং বজ্রধারী। মহাভারতের সময়েও (Epic period) তিনি এক জন অগ্রগণ্য দেবতা; অগ্নি, বরুণ এবং যমের শ্রেষ্ঠ। পৌরাণিক সময়েও তিনি এক জন প্রধান দেবতা, কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই ত্রিত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাঁহার বাসস্থানের নাম স্বর্গ অথবা ইন্দ্রলোক; নন্দনকানন তাঁহার প্রমোদোদ্যানের নাম। তাঁহার রাজধানী অমরাবতী মেরুপর্ব্বতে অবস্থিত (the Olympus of the Greeks); বৈজয়ন্তী তাঁহার প্রাসাদের নাম, উচ্চৈঃশ্রবস্ তাঁহার অশ্ব, মাতলি তাঁহার সারথি, এবং শক্রধনুস্ তাঁহার ধনু। পৌরাণিক কবিগণ ইন্দ্র সম্বন্ধে অশ্লীল আখ্যায়িকা রচনা করিয়া ইন্দ্রের চরিত্রে অনেক দোষারোপ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইন্দ্রের সহস্রলোচন বিষয়ক আখ্যায়িকা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীরাজকুমারী দাস।



পুনা বিধবাশ্রমের ছাত্রীগণ।

পুনার বিধবাশ্রম।

ভারত-নারীর উন্নতি না হইলে এ দেশের উন্নতি অসম্ভব, এ কথা এখন এদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মুখে শোনা যায়, কিন্তু নারীগণের প্রকৃত উন্নতি চেষ্টায় দেশের অতি অল্প লোককেই যত্নশীল দেখিতে পাই। হিন্দু সমাজে বিধবা নারীর সংখ্যা প্রচুর। এই অসংখ্য হিন্দু বিধবাগণ যে ভাবে দিন যাপন করে তাহা লোকসমাজে অবিদিত নহে। ইহাদের অবস্থার উন্নতি হইলে, ইহাদের শক্তির সংব্যবহার হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। প্রাতস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়া হিন্দু বিধবার দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে দুইটী লোক ব্যতীত হিন্দু বিধবাদিগের জ্ঞানোন্নতি ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের চেষ্টা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। বঙ্গদেশে শ্রদ্ধাস্পদ শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং বোম্বাইয়ের পণ্ডিতা রমাবাই বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া, হিন্দু বিধবাদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু শশীপদ বাবুর বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিধবাশ্রমের কার্য্যও বন্ধ হইয়াছে; পণ্ডিতা রমা-বাইয়ের আশ্রম ক্রমে ক্রমে বিধবাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উপায় স্বরূপ মাত্র হইয়াছে বলিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ আর সেখানে বিধবাদিগকে প্রেরণ করেন না। বর্ত্তমান সময়ে পুনার হিন্দু বিধবাশ্রমই এদেশে একমাত্র সুপরিচালিত বিধবাশ্রম। বর্ত্তমান সময়ে ৬০ জন বিধবা সেখানে বাস করিয়া আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছে। ইহাদের অনেকে সুশিক্ষিতা হইয়া ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়। আমরা সংক্ষেপে এই আশ্রমের উৎপত্তি ও বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদের দেশবাসীগণ কোন মহৎকার্য্য আরম্ভ করিলে প্রায়শঃই যে তাহাতে বিফল প্রযত্ন হয়েন তাহার একটী কারণ এই, যে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যে সকল আয়োজন করা প্রয়োজন, পূর্ব্বাহ্নে তাহা না করিয়া অসম্পূর্ণ আয়োজন লইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়। কার্য্যে সফলতা লাভের পক্ষে ইহা অতি গুরুতর অন্তরায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবাসীগণই এবিষয়ে প্রধানভাবে দোষী। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে মহা হৈ চৈ আরম্ভ হয়, বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জল্পনা কল্পনা বাহিরে প্রকাশ করা হয়, অথচ নীরবে, ধীরে প্রথমে যে দৃঢ় ভিত্তি রচনার প্রয়োজন তাহাই নিতান্ত শিথিল থাকিয়া যায়। এই কারণে বঙ্গদেশে কত মহৎ কার্য্য পণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। বোম্বাইবাসীগণ এবিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কার্য্যকুশল, তাই পুনার বিধবাশ্রমটী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "পুনা বিধবাশ্রম সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রথমেই আশ্রম স্থাপন না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। আবেদনকারিণী বিধবাগণকে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে রাখিয়া তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। আড়াই বৎসর পরে তাঁহাদের হস্তে দশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইল এবং অনেকে বার্ষিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে দুইটীমাত্র বিধবা লইয়া বিধবাশ্রম স্থাপিত হইল। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ইতিপূর্ব্বে এই সমিতির সাহায্যে দশটী বিধবা শিক্ষালাভ করিতেছিল, শিক্ষার ব্যাঘাত হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে আশ্রমের বাড়ীতে না আনিয়া স্কুলেই রাখা হইল। শ্রীযুক্ত খারবে ও তাঁহার পত্নী আশ্রমের ভার গ্রহণ করিলেন। ধীরে ধীরে সকল বিষয়ে আশ্রমের উন্নতি হইতে লাগিল, আশ্রমের নিজ বাড়ী নির্ম্মিত হইল, আশ্রিত বিধবার সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই এগার বৎসরে আশ্রমের বিধবার সংখ্যা দুইটী হইতে যাটটি হইয়াছে, আশ্রমের বর্ত্তমান গৃহগুলির মূল্যের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ৯ মাসের যে আয়-ব্যয়-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যে এই নয়

মাসে দশ হাজার টাকা ব্যয় বাদে সমিতির হস্তে প্রায় ৩২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিধবাগণ সংসারে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলাই এই আশ্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষার সময় ব্যতীত পরে বিধবাগণ আশ্রমের ব্যয়ে আশ্রমে থাকিতে পারে না। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কেহ কেহ ভবিষ্যতে লোকসেবা ও রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আশ্রম সংসৃষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া অনেক কুমারী বালিকাও এই আশ্রমে প্রবেশ করে, তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। অনেক বিধবাও নিজ ব্যয়েই আশ্রমে থাকেন।

শিক্ষার্থিনীগণকে প্রথম দুই বৎসর লেখন, পঠন ও সামান্য অঙ্ক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। মারাঠী চতুর্থ পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে কবিতা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভূগোল মানচিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করা না করা শিক্ষার্থিনীর ইচ্ছাধীন। অল্প পরিমাণে সেলাই প্রভৃতি শিল্প শিক্ষাও আরম্ভ হইয়াছে।

আশ্রমবাসিনীগণকে প্রতিদিন আশ্রমের গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে হয়। ময়দা পেষণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যও তাহাদিগকে প্রতিদিন ১৫।২০ মিনিট করিতে হয়। কিন্তু মোটের উপর দেড় ঘণ্টার অধিক গৃহকার্য্য কাহাকেও করিতে হয় না। অবস্থাপন্ন বিধবাগণও আশ্রমে বাসকালে উৎসাহের সহিত এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে অন্ততঃ ছয় জন লোকের রন্ধন কার্য্যে ও পরিবেশনে দক্ষতা লাভ করিতে হয়।

প্রতিদিন শিক্ষার্থিনীগণ কয়েক মিনিট স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বরারাধনা করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রতিদিন প্রথম পনর মিনিট কাল ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদত্ত হয়। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থিনীগণ গীতা হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার অনুবাদ করে, নিম্ন শ্রেণীস্থগণ মারাঠী ভাষায় সাধুবচন আবৃত্তি করে। অল্পবয়স্কাগণ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত গান করে। বয়স্কাগণও "গীতা মন্দিরে" প্রবেশ করিয়া সকলে এক সঙ্গে পদ ও অভঙ্গ গান করে।

এই প্রকার একটী আশ্রমের স্থায়ীত্ব প্রধানতঃ স্বার্থ-ত্যাগী সেবক সেবিকার উপর নির্ভর করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আশ্রমের আভ্যন্তরীণ পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার ধারবে দম্পতিই বহন করিয়াছিলেন। শিক্ষাদান কার্য্য ২।১ জন পুরুষ শিক্ষকের উপর ন্যস্ত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় শ্রীমতী পার্ব্বতীবাই আথবালে নামক জনৈক শিক্ষিতা মহিলা এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। তৎপর ক্রমে ক্রমে শ্রীমতী বেনুবাই দেশ-পাণ্ডে, শ্রীমতী নামযোশী ও শ্রীমতী দেবধর এই তিন জন সুশিক্ষিতা মহিলাও এই মহৎ কার্য্যকে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দুই তিন জন অল্প শিক্ষিতা মহিলাও তাঁহাদের জীবন এই কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই মহিলাগণই এখন আশ্রমের জীবন স্বরূপ। শ্রীমতী দেবধর আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে দুই এক মাসের জন্য অবসর লইয়া তিনি বক্তৃতাদি দ্বারা সাধারণের নিকট আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। শ্রীমতী নামযোশীও সময় সময় এই প্রকার প্রচার কার্য্যে বহির্গত হন। শ্রীমতী আথবালে বৎসরের সমস্ত সময়ই এই প্রকার প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অর্থ সংগ্রহ ব্যতীত এই প্রকার প্রচার দ্বারা আর এক গুরুতর উপকার এই হয়, যে হিন্দু বিধবাগণ ও এদেশের নারীজাতির প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য জ্ঞানের কিঞ্চিৎ উন্মেষ হয়। বাস্তবিক মহারাষ্ট্র মহিলাগণ তাঁহাদের দুঃখিনী ভগিনীগণের জন্য যেরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিতেছেন ভারতের অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তাঁহাদের এই সেবাব্রত দ্বারা এদেশের নারীজাতির যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। (সংকলিত)

রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী।

বর্ত্তমান সংখ্যায় "রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী" নামক রবি-বর্ম্মার অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। হিন্দু পুরাণোক্ত একটী ঘটনা অবলম্বনে এই চিত্রটী অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে রুক্মাঙ্গদ নামে একজন ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত একাদশীর উপবাস করিতেন। দেবতাগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দৈব মায়াদ্বারা মোহিনী নাম্নী এক নারী সৃষ্টি করেন এবং এই নারী রাজা রুক্মাঙ্গদের কনিষ্ঠা মহিষী পদাভিষিক্তা হয়। মোহিনীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রুক্মাঙ্গদ তাহাকে বর প্রদানে অঙ্গীকার করিলে এক একাদশীর দিন মোহিনী রাজার সম্মুখে কতকগুলি খাদ্য উপস্থিত করিয়া কহিল, অঙ্গীকৃত বর স্বরূপে সে তাঁহার সপত্নী-পুত্রের ছিন্ন মস্তক দেখিতে চাহে; রাজা যদি পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে অসম্মত হন, তবে উপবাস ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আনীত খাদ্য ভোজন করিতে হইবে। রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। রাজার সেই শিশুপুত্র পিতাকে বিপন্ন দেখিয়া ধর্ম্মনাশ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ এই বলিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিবার জন্য পিতাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। পিতাও ধর্ম্মনাশ অপেক্ষা পুত্রের মস্তক ছেদনই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া খড়্গহস্তে পুত্রকে হত্যা করিতে প্রস্তুত হইলেন। পুরনারীগণ শোকে আকুল হইলেন, জেষ্ঠা মহিষী—সেই শিশুপুত্রের জননী—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মোহিনী কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিল না। রুক্মাঙ্গদের ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া দেবতা প্রসন্ন হইলেন, বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া শিশুহত্যা নিবারণ করিলেন, এবং রুক্মাঙ্গদকে বর দিতে চাহিলেন, দৈবী মায়াপ্রসূত মোহিনী শূন্যে অদৃশ্য হইল।

ভারত-মহিলা পরিষদ।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতি ও তদনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠান গুলি যথা-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক ঋষি, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞান-জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বাধীনে মহাসমিতির কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সমাজসংস্কার সমিতি, মদ্যপান নিবারিণী সমিতি, শিল্প কৃষিসমিতির অধিবেশনও যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯শে ডিসেম্বর বেথুন কলেজ গৃহে ভারত-মহিলা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল, বরদার মহারাণী সভানেত্রীর পদে বৃতা হইয়া যে হৃদয়স্পর্শী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমরা ভারত-মহিলায় তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ছয় শত মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা মহিলা সমিতির কর্ম্মকর্ত্রীগণ যেরূপ উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা আমাদের সকলেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল (১) ১ম সঙ্গীত, (২) অভ্যর্থনা-সভা-নেত্রী মাননীয়া শ্রীমতী কুচবেহারের মহারাণী কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা, (৩) কলিকাতা মহিলা-সমিতির সভানেত্রী কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা, (৪) মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী কর্ত্তৃক মাননীয়া বরদার মহারাণীকে সভা-নেত্রীর পদে বরণ-প্রস্তাব, (৫) শ্রীমতী যাদুমতি দেবী কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থন, (৬) শ্রীমতী বরদার মহারাণীর বক্তৃতা। তৎপর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ১৩।১৪টী প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং আর একটী বাংলা, একটী মারাঠী সঙ্গীত, এবং কুমারী সুধাহাসি মিত্র নাম্নী একটী অল্প-বয়স্কা বালিকা কর্ত্তৃক একটী আবৃত্তি ও তৎপর কিঞ্চিৎ জলযোগ ও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। একটী সঙ্গীত ও আবৃত্তির কবিতাটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(শ্রীমতী সরলা দেবী-রচিত)

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
জয় জয় হিন্দুস্থান!
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান!
জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!
ভেদ-রিপু-বিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনী মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
জয় জয় হিন্দুস্থান!
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান!
জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান!
সকল-জন উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন গান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম্ম-নিশান! ধর্ম্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!

—

আমাদের মা সোণার বাঙ্গলা।

(শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত)

খোকার চখে ঘুম আসে, চুমি চাঁদ মুখে,
খোকামণি করবে খেলা বাঙ্গলা দেশের বুকে।
কত রতন আছে বাছা, সোণার বাঙ্গলা জুড়ে,
বড় হ'লে খোকামণি আনবে মাটী খুঁড়ে।
বাঙ্গলা জুড়ে আছে জল, জলে আছে মাছ,
বাঙ্গলা দেশের বনে আছে, মিষ্ট ফলের গাছ।
আছে কত ধানের জমি, ফুলের বাগান কত,
আর কোন দেশ নয় ত বাছ, বাঙ্গলা দেশের মত।
বাঙ্গলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোণার বাঙ্গলা, তাঁকেই প্রণাম করি।

আয় আয় ঘুম আয়, খোকার চখে আয়,
বাঙ্গলা দেশের আকাশ ভরে আলো ভেসে যায়।
সেই আলোতে বয়ে বয়ে চাঁদের হাসি ধ'রে,
ঝুরঝুরে ঐ বাতাস আসে, পাতার কোল ঝ'রে।
বাঙ্গলা দেশের এমন বাতাস, এমন চাঁদের হাসি,
আর কোথাও নাই, আমরা সবাই, বাঙ্গলা ভালবাসি।
তুমিও বাছ, বড় হ'লে বাঙ্গলা ভাল বেসো,
বাঙ্গলার দুখে কেঁদো খোকা, বাঙ্গলার সুখে হেসো।
কাজের তরে বিদেশ গেলে বাঙ্গলা ভুল না,
সদাই মনে রাখবে বাছা, বাঙ্গলা তোমার মা।
বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোণার বাঙ্গলা, তাঁকেই প্রণাম করি।

আয় আয়, ঘুম আয়, যাদু মণির চখে,
শালিক, টিয়া, ময়না, ফিঙে, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোকিল, শ্যামা, বউ কথাকও, সোণার রঙ্গের পাখী,
বাঙ্গলা দেশে, নীল আকাশে, উড়ে বেড়ায় ডাকি।
গরু, ছাগ, গাধা, ভেড়া, বেড়ায় পালে পালে,
রুই, কাতলা, ট্যাংরা, পুঁটী সাঁতারে বিলে খালে।
আমাদের মা বাঙ্গলা যেমন, তেমন সোণার দেশ,
নাইক কোথাও, বাঙ্গলা মায়ের দয়ার নাইক শেষ।
খালে বিলে জল থই থই, ক্ষেতে ভরা ধান,
কতই আছে মায়ের ঘরে, চাইলে করেন দান।
মায়ের ঘরে চাইবে খোকা, মায়ের ঘরে পাবে,
পরের দ্বারে চাইতে খোকা, কখনও না যাবে।
মায়ের ছেলে কাপড় বোনে কিনতে হবে তা,
অন্য দেশের ভাল কাপড় খোকা ছোঁবে না।
বাঙ্গলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোণার বাঙ্গলা, তাঁকেই প্রণাম করি।

—

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।



মণিকার প্রার্থনা।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

চৈত্র মাসে ভারত-মহিলার বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হইবে। বৈশাখে তৃতীয় ভাগ আরম্ভ হইবে। বৎসরের প্রথম হইতেই প্রতি সংখ্যা ভারত-মহিলায় এবং অন্যান্য পত্রিকায় আমরা এবিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছি।

আগামী বর্ষ।

ভারত-মহিলার তৃতীয় ভাগ ১৩১৪ সনের বৈশাখে আরম্ভ হইয়া চৈত্রে শেষ হইবে। দ্বিতীয় বর্ষে আমরা ৩২ ফর্ম্মা কাগজ ও ৩২ খানা ছবি দিলাম, তৃতীয় বর্ষে ৩৬ ফর্ম্মা কাগজ ও অনূ্যন ৩৬ খানি ছবি দিব। ভারত-মহিলার ন্যায় চিত্র-বহুল পত্রিকার খরচ অত্যন্ত অধিক। আগামী বৎসরে ছবি ও আকার বৃদ্ধিতে আরো ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, এজন্য আমরা এবার চারি আনা মূল্য বৃদ্ধি করিলাম। তৃতীয় বর্ষের ভারত-মহিলার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

তৃতীয় বর্ষের মূল্য।

বৈশাখ সংখ্যা ভারত-মহিলা গ্রাহকগণের নিকটে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া তৃতীয় বৎসরের অগ্রিম মূল্য ২।০ আনা লইব। যাঁহাদের পত্রিকা লইবার সুবিধা হইবে না, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ২০শে চৈত্রের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

ভারত-মহিলা কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

২য় ভাগ। } ফাল্গুন, ১৩১৩। { ৭ম সংখ্যা।

স্বদেশী বস্তু প্রচারে বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য।

এবার কলিকাতায় জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশনে বহু বঙ্গীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনান্তে, যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, তখন বোম্বাই নিবাসী এক জন গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন, "বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল, ধনী ও শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের গৃহে আজিও 'স্বদেশী' প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।" তাঁহার এই মন্তব্য যথার্থ কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য, যে মহিলাগণ দৃঢ়ভাবে 'স্বদেশী'কে গ্রহণ না করিলে পুরুষদিগের আন্দোলন ও শ্রম অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইবে।

বিদেশী পণ্য কেন বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য তাহাতে আমাদের উপকার কি, ইত্যাদি বিষয় এখানে উত্থাপন করিব না। অন্যত্র অনেকে তাহার আলোচনা করিতেছেন, আমিও যথাশক্তি সেই আলোচনায় যোগ দিয়া আসিতেছি। আমি শুধু স্বদেশী বস্ত্র প্রচারের একটী দিক, মহিলাগণের দৃষ্টিপথে আনিতে চাই।

আমার মাতুলগ্রাম নিবাসী——বসু শৈশবে পিতৃহীন হন। তাঁহার অনাথা জননী সূতা কাটিয়া তাঁহাকে পালন করেন, এবং কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইতে সমর্থ হন। কালক্রমে ইনি অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন সহায়ে সৌভাগ্য-মঞ্চে আরোহণ করিয়া প্রভূত ধন ও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এখন বঙ্গদেশ হইতে চরকা উঠিয়া গিয়াছে—কোনও অসহায় ভদ্রমহিলা সূতা কাটিয়া যে আপনার সন্তানকে প্রতিপালন করিবেন, সে উপায় আর নাই। সুতরাং এই বসু মহাশয়ের ন্যায় কত প্রতিভাশালী বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে, কে বলিতে পারে? স্বদেশী শিল্প ধ্বংসের ইহা এক বিষময় ফল।

মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলায় এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে এক সময়ে সহস্রপতি, লক্ষপতি তন্তুবায়-গণের আবাস ছিল। এই সকল গ্রাম হইতে কোটি কোটি টাকার বস্ত্র ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইত। ইংরেজগণের অধর্ম্মাচরণে এই ঋদ্ধিমান্ বস্ত্রশিল্প লুপ্ত হইয়াছে—বনাকীর্ণ সৌধাবলির ধ্বংসাবশেষ এই সকল তন্তুবায়দিগের অতীত ঐশ্বর্য্যের নীরব সাক্ষ্য দিতেছে, কত তন্তুবায়-পরিবার জাতীয় ব্যবসায় হারাইয়া

হলচালনা দ্বারা বা ভৃত্যের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছে, কত তন্তুবায় রমণী উদরের জ্বালায় দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। শিক্ষিতা বঙ্গরমণীগণ তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস খুঁজিয়া দেখুন, বৈদেশিক শিল্প বঙ্গীয় সমাজের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার তুলনা আর কোনও দেশে দুর্লভ।

দেশীয় শিল্প ধ্বংস হওয়াতে ভদ্রবংশীয় নিঃসহায় বিধবাদিগের কোনও জীবনোপায় নাই। এজন্য বহুস্থলেই তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া অতি দুঃখে কালযাপন করেন। শুধু তাহাই নয়। কলিকাতা-বাসী মাত্রেই জানেন, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা হইতে শত শত ভদ্রঘরের বিধবা কলিকাতায় আসিয়া পরিচারিকার কার্য্য গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কলিকাতার ন্যায় প্রলোভন পূর্ণ রাজধানীতে অরক্ষিত অবস্থায় বাস করিয়া সময়ে সময়ে ইঁহাদের অনেকে কি দুর্গতিতে পতিত হন, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই নৈতিক দুর্গতির জন্য দায়ী কে? শিক্ষিতা রমণীগণ বলুন, এই যে তাঁহাদের শত শত ভগিনী দেহ বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে কি না। আজ যদি দেশীয় শিল্প লুপ্ত না হইত, আজ যদি ঘরে ঘরে চরকা থাকিত, তবে এই হতভাগিনীদিগের অনেকে সৎ পথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত। দেশীয় শিল্প উদ্ধারের একটী মহোপকার এই যে, ইহা বঙ্গসমাজের নৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু দীনা, অশিক্ষিতা ভগিনীর দুঃখে যদি সৌভাগ্যবতী শিক্ষিতা ভগিনী উদাসীন থাকেন, তবে তাহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সভ্যজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই, রমণীগণ দৃঢ়ব্রত হইলে অতি কঠিন কর্ম্মও সুসাধ্য হয়। ২১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কার্থেজের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামের সময়, মহিলাগণের বস্ত্রালঙ্কারের ব্যয় খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে রোমে একটী আইন বিধিবদ্ধ হয়। রোমক-রমণীগণ স্বদেশপ্রীতিতে পুরুষদিগের অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তাঁহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া এই আইন পালন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যখন বিপৎ কাটিয়া গেল, দুর্দ্ধর্ষ হানিবল জামার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইলেন, কার্থেজ রোমের পদানত হইল, তখন ঐ আইনের প্রয়োজন রহিল না, সুতরাং সিনেটে ঐ আইন উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু দুই জন রাজপুরুষ প্রতিবাদী হওয়াতে মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তখন রোমের ভদ্রমহিলাগণ সিনেটের অধিবেশনের দিন প্রত্যূষে রাজপথে বাহির হইয়া এমন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আইন উঠাইবার জন্য আপন আপন স্বামীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, যে সকল প্রতিবাদ ও বাধা কোথায় ভাসিয়া গেল, আইন রহিত হইল। বঙ্গমহিলাগণ যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে স্বদেশী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন, তবে দুদিনে এই হতভাগ্য দেশের শ্রী ফিরিয়া আইসে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরডটস্ লিখিয়াছেন, আর্গস নামক ক্ষুদ্র নগর একবার যুদ্ধে একটী অতি ক্ষুদ্র গ্রাম হারায়। তাহাতে আর্গসের রমণীগণ শপথ করেন, যতদিন ঐ গ্রামের পুনরুদ্ধার সাধিত না হইবে, ততদিন তাঁহারা অলঙ্কারে কেহ দেহ সজ্জিত করিবেন না। জানি না, কত দিন তাঁহাদিগকে অলঙ্কারহীন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা জানি, বঙ্গদেশ একটী ক্ষুদ্র নগর নহে, বঙ্গব্যবচ্ছেদও একটী ক্ষুদ্রগ্রামের অপহরণ নহে।

এ সকল অতি প্রাচীন কালের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে একবার তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ভুবনবিখ্যাত বাগ্মী চার্লস্ জেম্‌স্ ফক্‌স্ ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রতিনিধি-পদপ্রার্থী ছিলেন। তিনি রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চক্ষুশূল ছিলেন, এজন্য তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিসমাজ আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যাহাতে ফক্স নির্ব্বাচিত না হন। কিন্তু লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ফক্‌সের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ডাচেস্ অব ডিবনশিয়ারের অধিনায়কত্বে ইঁহারা এমন অদম্য উদ্যমের সহিত নির্ব্বাচকদিগকে ইঁহার পক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করেন, যে রাজা ও মন্ত্রীদিগের সমস্ত

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়, ফক্স্ জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহিলাদিগের প্রভাব সম্বন্ধে বিদেশ হইতে এই কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। অন্য ক্ষেত্রের কথা বলিতে হইলে, ভারতের বাহিরে যাইতে হইত না, এ দেশেরই এমন অনেক পুণ্যশ্লোকা রমণীর নাম করা যাইতে পারিত, যাঁহাদিগের মহতী কীর্ত্তি ইতিহাস কখনও ভুলিতে পারিবে না।

আমাদের ইহা বলা অভিপ্রেত নয়, যে ভারতের এই নবজাগরণের দিনে মহিলাগণ নিশ্চেষ্ট আছেন। স্বদেশ-প্রেমিক কবি অনেক দিন হইল গাহিয়াছিলেন,

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগেনা।"

মনে হইতেছে, এবার বুঝি ভারত ললনা সত্য সত্যই জাগিয়াছেন। এবারকার মহিলা-সমিতি তাহারই পূর্ব্বাভাস বলিয়া বোধ হইতেছে। দুই এক দিনে একটা মৃতকল্প পতিত জাতির উদ্ধার সাধিত হয় না, এখনও অনেক করিবার আছে, পথ সুদীর্ঘ, তথাপি আশা হইতেছে, জাতীয় উন্নতির অস্ফুট অরুণালোক পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। বরোদার মহারাণীর উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা এই আশাকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতেছে। আমরা তাঁহার সারগর্ভ মন্তব্যের প্রতি বঙ্গীয় ভগিনীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে উহার একটা স্থূল অনুবাদ করিয়া দিতেছি।*

"ভারতীয় শিল্পকলার প্রসার বৃদ্ধি করা মহিলা-সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। যে স্বদেশী আন্দোলন এক্ষণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য, মান্দ্রাজ, মহীশুর ও ত্রিবাঙ্কুর—সমগ্র ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, উহাকে বঙ্গীয় মহিলাগণ কেমন সাহায্য ও সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমি অবগত আছি।

"আপনারা অকুতোভয়ে যে মহা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন, এবং যাহাকে এরূপ মহাপ্রাণতার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমরা আহ্লাদ ও বিস্ময়ের সহিত তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। আজ সমস্ত ভারত এই মহৎ দেশহিতকর উদ্যমে মিলিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে দেশীয় পণ্যশালা সকল স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র সমূহে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, গত দুই বৎসরে বঙ্গদেশে তাঁতের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে, গৃহস্থালীর উপযোগী ধাতব ও অন্য প্রকারের দেশীয় বাসনের ব্যবহার দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইতেছে। আমি অবগত হইলাম, সহস্র সহস্র তন্তুবায় ও ধাতুশিল্পী—যাহারা জাতীয় ব্যবসায় হারাইয়াছিল—আবার আপন আপন কর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং বহু গ্রাম্য-পরিবারে আমাদের নিঃ
ভগিনীগণ—আমাদের দরিদ্র শিল্পীদিগের মাতা, পত্নী
কন্যাগণ—প্রাণে নবীন কর্ম্মোৎসাহ ও নবীন আ
অনুভব করিতেছে। ইতিহাস যদি জাতীয় উন্নতি
কাহিনী হয়, তবে উহা এই মহা আন্দোলনের আশ্চ
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবে—যে আন্দোলন বয়সে
শিশু হইয়াও ইতোমধ্যেই এরূপ জয়শ্রী লাভ করিয়া
এবং যাহাকে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য স
ভারতীয় জাতি কৃতসংকল্প হইয়াছে। আসুন, আম
ভারত-রমণীগণ সমগ্র হৃদয়ের সহিত এই আন্দোল
যোগ দেই। প্রতিদিন গৃহে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজা
নির্ব্বাচনের সময়, এবং আমাদিগের নিজের
সন্তানগণের জন্য বস্ত্রালঙ্কার ক্রয় কালে, আমরা
দীন ভারতের লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় ও শিল্পীদিগের
আবেদন স্মরণ করি, যাহাদিগের দুঃখ দূ
করিবার ক্ষমতা আমাদেরই হাতে।
যেখানেই আমরা বাস করি না
ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম বিশ্বাস যাহাই
জন্মভূমির উন্নতি ও কল্যাণ
উদ্দেশ্য ও উদ্যমে মিলি

* মাঘ মাসের ভারত-মহিলায় মহারাণীর সমগ্র বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটী তৎপূর্ব্বেই আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। পুনরুক্তি হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য নাশ হইবে আশঙ্কায় আমরা শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় প্রদত্ত অনুবাদাংশ পরিত্যাগ করিলাম না। ভাঃ মঃ সঃ।

অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও উদ্দীপনা কিছুই রক্ষিত হইল না। প্রার্থনা করি, মহারাণীর এই আকুল আহ্বান যেন বঙ্গীয় রমণীসমাজে ব্যর্থ না হয়।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এই জন্য প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুগণ ইঁহাকে নিজ পক্ষে এবং ইঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মার্জ্জিত রুচি দেখিয়া নব্য শিক্ষিতগণ ইঁহাকে নিজ পক্ষের লোক ভাবিতেন। প্রকৃত পক্ষে ইনি কাহারও কোনরূপ ভ্রম প্রদর্শন করিতে কখনও বিমুখ হইতেন না। ফল কথা, ইনি সত্যের পক্ষপাতী ছিলেন। "প্রেমযোগিনী" নামক নাটকে দেবমন্দির ও তীর্থ-নিবাসী পাণ্ডাদের অত্যাচার-কাহিনী বিস্তার পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় উহা সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। ল্প বয়সেই ইঁহার বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ হইয়াছিল। খন ইনি দ্বাদশবর্ষীয় বালক সে সময় কাশীরাজের দানীন্তন সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয় হারাজের আজ্ঞাক্রমে একখানি সংস্কৃত পুস্তক প্রণয়ন রেন। সেই পুস্তক সম্বন্ধে এই প্রতিভাসম্পন্ন বালকের ক্তিসঙ্গত মতামত তর্করত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতে হয়। তনি ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

ইনি সর্ব্বপ্রথমে কাশীতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচার করেন, এবং উক্ত চিকিৎসার গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজ ব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন।

যে সময় লর্ড লিটনের দিল্লী-দরবার হয় সে সময় কয়েক লক্ষ ভারতবাসীর হস্তাক্ষর যুক্ত একখানি ... গোহত্যা নিবারণ কল্পে রাজসমীপে প্রেরণ ... জনহিতকর বা দেশহিতকর কার্য্যের ...সভাসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ... "কার মাইকেল লাইব্রেরী" ...। কাশীর কোম্পানীর বাগানে সাধারণের বসিবার কোন আসন না থাকায় কয়েকখানা লৌহাসন নিজ ব্যয়ে প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ বেণীমাধবের ধ্বজা হইতে অসাবধানতাবশতঃ প্রায়ই লোক পড়িয়া যাইত, সেখানে নিজ ব্যয়ে রেলিং লাগাইয়া দেন। জর্ম্মান যুদ্ধের ইতিহাস, ছোট লাট মেওর মহোদয়ের জীবনী, ইত্যাদি কতকগুলি পুস্তক লিখিবার জন্য তিনি লেখকদিগকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। কতকগুলি হিন্দী সংবাদ পত্র ইঁহার উৎসাহে প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে কয়েকখানি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইনি কুমারী কার্পেণ্টারের স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। মিঃ শেরিঙ্গ, ডাক্তার হার্ণেলী, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর মহোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ-লেখকদিগের গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন, একথা উক্ত লেখক মহাশয়েরা নিজ পুস্তকে ধন্যবাদপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। থিওসফিকেল সোসাইটীর সংস্থাপক কর্ণেল আলকট ও ম্যাডাম ব্ল্যাভেট্স্কী যখন কাশীতে আইসেন, তখন তাঁহাদিগকে ইনি অনেক সহায়তা করেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে যে সকল বালিকা ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদিগকে শিক্ষা বিভাগ দ্বারা শাড়ী পারিতোষিক দেওয়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বেথুন বিদ্যালয়ে যে শাড়ীগুলি দেওয়া হয়, তাহা শ্রীমতী লেডী রিপন মহোদয়া নিজ হস্তে বিতরণ করেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন ডাইরেক্টর আলফ্রেড ক্রফ্ট্ মহোদয় লিখিয়াছিলেন, "যে সময় ভবদীয় প্রদত্ত উপহার ছাত্রিগণকে প্রদান করা হয়, সে সময় সভাস্থলে আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হয়।" ব্রাহ্ম-বিবাহ বিষয়ক আইন পাশের সময় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়কে ইনি সাহায্য করেন, তজ্জন্য সেন মহাশয় পত্র দ্বারা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নিজ স্থাপিত "ন্যাশনেল ফণ্ডে"র অর্থের জন্য যখন কাশীতে আগমন করেন, সে সময় তাঁহাকেও অনেক সাহায্য করেন, এবং তাঁহার সম্মানার্থে একটা 'ইভিনিং পার্টি' বা সান্ধ্য ভোজ দেন। "ইন্‌কম টেক্স" বা আয়কর স্থাপন কালে গবর্ণমেণ্টের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

৪

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইনি গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। কাশীতে কোন গুণী লোক আসিলে ইনি তাঁহার যথোচিত সম্মান করিতেন, এবং গুণানুরূপ পুরস্কার দিতেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের দিকে ইঁহার অত্যন্ত অভিরুচি ছিল। ইঁহা দ্বারা ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনেক সহায়তা পাইতেন। ইঁহার লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেল ও প্রোসিডিংএ প্রকাশিত হয়। ইঁহার পুস্তকালয়ের প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে উক্ত সোসাইটী অনেক সাহায্য লাভ করেন। ভারতেন্দুর স্বভাবে পরিহাস-প্রিয়তাও বিলক্ষণ ছিল, কতবার পহেলা এপ্রিলের দিন সমস্ত কাশীসুদ্ধ লোককে 'এপ্রেল ফুল' করিয়াছিলেন। ইঁহার অপরিমেয় উদারতার উদাহরণের জন্য নিম্নে একটী ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

সম্পত্তি বিভাগের অল্পদিন পরে বেতিয়া রাজের নিকট হইতে ইঁহার অংশের ছত্রিশ হাজার টাকা আদায় হইয়া আসে, তাহা হইতে অল্প মাত্র নিজে রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ নিজের কোন সহচরের নিকট গচ্ছিত রাখেন। ইতিমধ্যে এক দিবস সহচর প্রবর কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নিবেদন করিলেন, যে "আমার ঘরে চুরি হইয়া গিয়াছে এবং আপনার গচ্ছিত অর্থের সহিত আমারও যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে।" ইহার ক্রন্দনের জ্বালায় অস্থির হই। ভারতেন্দু মহাশয় বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন? যাহা হইবার হইয়াছে, চোর যে তোমাকে চুরি করে নাই, ইহাই সৌভাগ্য।" অনেকে উহাকে মন্ত্রণা দিয়া টাকা আদায় করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পরম উদার-চিত্ত ভারতেন্দু কিছু না করিয়া বলিলেন, "খাইতে দাও, গরীব মানুষ উহা দ্বারাই উদর পূরণ করিবে।" উহাকে নিজ সাহচর্য্য হইতে দূর করিলেন না। সখ করিয়া যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন কেহ যদি সে সব বস্তুর প্রশংসা করিত তখনি সে দ্রব্য প্রশংসাকারীকে উপহার দিতেন। একবার একটা আলবম অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেন। এক দিবস কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহোদয় সেই আলবমটীর অতিশয় প্রশংসা করেন, ভারতেন্দু চিত্রাধারটী তাঁহাকে অর্পণ করেন। উক্ত আলবমে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সম্রাট, বিদ্বান্, আচার্য্য ইত্যাদির মূল্যবান চিত্র ছিল। এই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটী হস্তান্তরিত হওয়াতে ইনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে কাহাকেও কোন দ্রব্য দান করিয়া ইঁহাকে কেহ দুঃখিত হইতে দেখে নাই। পরে এইরূপ আলবমের জন্য পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পাইলেন না। গুপ্ত দান করিতে বড় ভালবাসিতেন। প্রায়ই পথিমধ্যে খামে পুরিয়া নোট এবং কাগজের মোড়কে টাকা ফেলিয়া আসিতেন। একবার কোন স্থান হইতে এক ছড়া পুষ্পহার পরিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, পথে চৌমাথার উপর মালাটা গুটাইয়া রাখিয়া দিলেন। সঙ্গে যে চাকর ছিল তাহার মনে সন্দেহ জন্মে; সে উঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া গিয়া মালাটা কুড়াইয়া দেখিল উহার মধ্যে পাঁচটি টাকা জড়ান রহিয়াছে। একদা রাত্রিকালে পথিমধ্যে একটী শীতক্লিষ্ট ভিখারীকে নিজ গাত্রের বহুমূল্য শাল দান করিয়া আসেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ধন সম্পত্তি ভাগ হয়। চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ব্যয় হইয়া যায়। মৃত্যুর দশ এগার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইঁহার কাছে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কখনও কখনও এমন হইয়াছিল, যে "জল পান" খাইয়া দিন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শিক্ষা হয় নাই। পর দিবস যদি কিছু অর্থ হস্তগত হইল, তাহাও জলের মতন ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত দাতব্যটা কিছুতেই বন্ধ হইত না। যাচকের বাঞ্ছা পূরণ না করিতে পারিয়া যত দুঃখানুভব করিতেন ধন-হীনতার জন্য নিজে অবশেষে কষ্ট পাইলেও তত দুঃখিত হইতেন না। ঋণ গ্রহণ করা জীবনের সাথী ছিল, কিন্তু মরিবার সময় ঋণ বা ধন কিছুই রাখিয়া যান নাই। এই জন্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের সহিত ইঁহার তুলনা করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

ইঁহার লিখিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল। লিখিবার সময় নানারূপ বার্ত্তালাপ করিলেও লেখনীর বিশ্রাম ছিল না, এই জন্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহাকে লিখন-যন্ত্র (writing machine) নাম দিয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, যতই কেন শীঘ্র লিখুন না, হস্তাক্ষরের কোন তারতম্য হইত না। ইঁহার হিন্দী ও ইংরাজী হস্তাক্ষর অতি উত্তম ছিল। দোয়াত কলম সতত কাছে থাকিত। সমস্ত দিন সাহিত্যানুশীলন করিয়াও শ্রম বোধ করিতেন না। মনে যাহা উদয় হইত তখনি তাহা লিখিয়া রাখিতেন। কাগজের অভাবে দেয়ালের গায় এবং কলম না পাইলে খড়্‌কে দিয়াই কাজ সারিতেন। ইঁহার কবিত্ব শক্তি চমৎকার ছিল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৌখিক কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। অবসরোপযোগী কবিতা বা পুস্তক লিখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার কয়েকখানি বই এক এক দিনে রচিত হইয়াছে। স্বরচিত কাব্যের মধ্যে "প্রেম ফুলওয়ারী", নাটকের মধ্যে "সত্য হরিশ্চন্দ্র", "চন্দ্রাবলী", ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে "তদীয় সর্ব্বস্ব", ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে "কাশ্মীর-কুসুম" দেশ-দশা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে "ভারত-দুর্দ্দশা" ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল।

সর্ব্ব প্রথমে আরব্ধ "প্রবাস নাটক" সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নাটক ও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দীতে নাট্যাভিনয় করাইবার পক্ষপাতী ও উদ্যোগী ছিলেন। ইঁহার রচিত "সত্য হরিশ্চন্দ্র", "বৈদিক হিংসা", "অন্ধের নগরী", "লীলাদেবী" এ প্রদেশে কয়েক বার অভিনীত হইয়াছে। ইঁহার অনুরোধে ও উৎসাহে "কাদম্বরী", "দুর্গেশ-নন্দিনী", "রাধারাণী", "স্বর্ণলতা" ইত্যাদি হিন্দীতে অনুবাদিত হয়। এ গুলিকে নিজে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। ইঁহার গ্রন্থাবলীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম—স্বলিখিত, দ্বিতীয়—কিছু স্বলিখিত ও কিছু অপরের লিখিত, তৃতীয়—অন্যের দ্বারা লিখিত বা অনুবাদিত এবং আপনাদ্বারা সংশোধিত। যাহা একবার লিখিতেন তাহা আর পুনরায় লিখিতেন না, এবং প্রুফ সংশোধন ব্যতীত উহা আর পুনরবলোকন করিতেন না। ইঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অগাধ ছিল। একবার নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন, "যদি উপযুক্ত শ্রোতা পাই তাহা হইলে ভারতীয় ধর্ম্ম রহস্য বিষয়ে দুই বৎসর কালব্যাপী অনবরত বক্তৃতা করিতে পারি, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধান ইঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। যাহা লিখিতেন তাহা খুব পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া নিখুঁত ভাবে লিখিতেন। ইতিহাস এত প্রিয় ছিল যে, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাহাই লিখুন না কেন তাহাতে অল্পাধিক ঐতিহাসিক চর্চ্চা থাকিত। জাতীয় সঙ্গীত খুব ভাল বাসিতেন। ইঁহার সদ্‌গুণাবলীতে বিমুগ্ধ হইয়া স্বদেশী বিদেশী সকলেই ইঁহাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "সার সুধানিধি" নামক হিন্দী পত্রে ইঁহাকে "ভারতেন্দু" উপাধি দিবার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব প্রকাশিত হইবামাত্র সমস্ত দেশবাসী উহা একস্বরে স্বীকার করেন। সেই হইতে সকলে ইঁহাকে ভারতেন্দু বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে ইহাই ইঁহার নামবিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। ইঁহার ভারতেন্দু উপাধি যে শুধু স্বদেশীয়দিগের দ্বারাই স্বীকৃত হইয়াছিল এমন নহে, ইউরোপীয়েরাও ইঁহাকে ভারতেন্দু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌মণ্ডলী ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "উত্তর ভারতীয় রাজ-কবি।" এডুকেশন কমিশনে ইঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল।

৫

ইঁহার চিত্ত অতিশয় কোমল ছিল, কাহারও দুঃখ ক্লেশ দেখিতে পারিতেন না। অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকিত। ইঁহার অন্তরে ক্রোধ ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু একবার রাগিলে আর রক্ষা থাকিত না। সে রাগ অল্পে যাইত না। সর্ব্বদা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতেন। কাশীর মহারাজা ইঁহাকে স্নেহ করিতেন ও অসময়ে সাহায্য করিতেন, ইনিও মহারাজাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সেই কাশীরাজের কোন কার্য্যে নিজকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া যাবজ্জীবন আর তাঁহার কাছে যান নাই। নিরভিমানী ও নম্রস্বভাব ছিলেন বটে, কিন্তু অপরের মিথ্যা অহঙ্কার সহ্য করিতে পারিতেন না। ইঁহার বড় চক্ষুলজ্জা ছিল, কেহ যদি সম্মুখ হইতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া লইয়া যাইত তবু মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। ইনি নিজ চরিত্রোল্লেখ

করিয়া একটী ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে সেইটী উদ্ধৃত করা হইল। *

সেবক গুণীজনকে, চাকর চতুরকে হওঁ,
কবিনকে মিতচিত, হিত গুণগাণীকে ॥১
সিধন সো সিধে মহা বাঁকা হম বাঁকন সো;
হরিচন্দ নগদ দমাদ অভিমানীকে ॥২
চাহিবে কো চাহ কাহকীন পরওয়া নেহী নেহকে,
দীওয়ানে সদা সুরত নীবানীকে ॥৩
সবরস রসিক সুদাস দাস প্রেমিনকে
সখা প্যারে কৃষ্ণকে গুলাম রাধা রাণীকে ॥

ইঁহার গদ্যানুবাদ এইরূপ হইতে পারে ঃ—"গুণীজনের সেবক, চতুরের চাকর, কবিগণের মিত্র এবং গুণ ও জ্ঞানের হিতাকাঙ্ক্ষী। ১। সরলের সহিত সরল, শঠের সহিত শঠ, এবং অভিমানী লোকের হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে জামাই হন। ২। যে ভালবাসে, তাকে ভালবাসি, যে স্নেহ করে তাহাকে স্নেহ করি, কাহারো আশা করি না, এবং সতত সুন্দর রূপের উপাসক। ৩। সর্ব্বরসের রসিক, প্রেমিকের দাস, প্রিয় কৃষ্ণের সখা এবং রাধারাণীর গোলাম।" ৪।

ইঁহার তিনটী সন্তান হয়, দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র দুটী শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়, কন্যাটীর বিবাহাদি হইয়াছিল। ভারতেন্দুর এখন পাঁচটী দৌহিত্র বর্ত্তমান।

ভারত-গৌরব হিন্দুপতি মহারাণা সজ্জন সিংহ ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাণার আগ্রহাতিশয্যে ইনি উদয়পুর গমন করেন। সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার পরেই অসুস্থ হন, শ্বাস-কাশী ও জর-রোগে জীবনসংশয় হয়। ইতিমধ্যে এক দিন প্রবল বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল; কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বুঝি ইচ্ছা ছিল না, যে ইঁহাকে [illegible] সময় ধরা হইতে অপসারিত করেন, ইঁহার দ্বারা আ[illegible] কিছু কাজ করাইয়া লইবার ইচ্ছা ছিল, তাই সে স[illegible] কালের হাতে নিষ্কৃতি পাইলেন। রোগমুক্ত হইয়[illegible] 'নাটক' নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। তাহার উৎসর্গ প[illegible] লিখিয়া ছিলেন, "নাথ! আমার জীবন নাটকের শে[illegible] অভিনীত হইবার অদ্য এক সপ্তাহ হইত, কিন্তু জ[illegible] না কাহার উপর অনুগ্রহ করিয়া, না কি ভাবিয়া উ[illegible] কার্য্যের আজ্ঞা হইল না। সংসারের নানাবিধ কুরোগা[illegible] দ্বারা মন প্রাণ ত পূর্ব্বাবধি রোগগ্রস্ত ছিল, আজ চা[illegible] মাস হইতে শরীরেও নানা ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে।"

রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইতে হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বের মতন উঠা বসা, সাহিত্যানুশীলন ইত্যাদি আরম্ভ করিলেন। মরিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শ্বাস-কাশী বাড়িল।

১৮৮৫ খৃঃ ২রা জানুয়ারী দিবস সহসা প্রবল বেগে জর হয়। অষ্টপ্রহরের পরে জর বিরাম হইয়া বুকে ব্যথার সূত্রপাত হয়। সেই অসহ্য বেদনায় চিকিৎসকে[illegible] জীবন শঙ্কটাপন্ন ভাবিলেন। ক্রমে কফের সহিত র[illegible] দেখা গেল। ৬ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে অপেক্ষা[illegible] কিছু সুস্থ ছিলেন। অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা সং[illegible] জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে ঈষৎ হাস্যসহকারে [illegible] আমার জীবন-নাটকের নিত্য নূতন 'প্রোগ্রাম' হই[illegible] হইতেছে; দেখি 'লাষ্ট নাইট' (শেষ রাত্রি) কবে[illegible] সেই দিনই শ্বাস বৃদ্ধি হইল। এই সময় হইতে সং[illegible] মায়া পরিত্যাগ করিলেন, আত্মীয়গণ কেহ স[illegible] আসিলে মুখ ফিরাইয়া লইতেন। বেলা ২টার সময় ভ্রা[illegible] কৃষ্ণচন্দ্রকে নিকটে ডাকিলেন, এবং উত্তম বেশ[illegible] সজ্জিত হইয়া আসিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পা[illegible] হইল; কিন্তু বালকের সাজসজ্জা মনোনীত হইল [illegible] আরও ভালরূপে সজ্জিত হইয়া আসিতে বলিলেন। এ[illegible] খানা আরাম চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত ভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোলে লইয়া আঙ্গুর খাওয়াইলেন। বালকের শীর্ষোপরি হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন রহিলেন, পরে "যাও খেলা কর" বলিয়া বিদায় দিলেন। শ্বাস উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; রাত্রি ৯টা বাজিল, অন্তিম সময়

* হিন্দী মাসিক পত্রিকা "সরস্বতী"তে ভারতেন্দুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আমার মত অযোগ্যের দ্বারা অনুবাদিত হইয়া মূল কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবার ভয়ে সবগুলি উদ্ধৃত করিতে পারি নাই; কেবল এটীর লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

নিকট হইল। সহসা বলিয়া উঠিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, ... রাম আতে ইএঁ মুখ দিখলাও।" তাহার পর ...কটী দোঁহা (হিন্দী পদ্য) বলিলেন, সমস্তটা বুঝা গেল ..., কেবল এই টুকু বুঝিতে পারা গেল, "শ্রীকৃষ্ণ...... ...হিত স্বামিনী।" রাত্রি পৌনে দশটার সময় ভারতো-...কারী ভারতেন্দু চিরকালের তরে অস্তমিত হইয়া ...লেন।

কাশীধামের সে সময়কার অবস্থা বর্ণনাতীত! ...রতের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত হাহাকার-ধ্বনি সমুখিত হইল। পেশোয়ার হইতে নেপাল ও কলিকাতা হইতে বোম্বাই অবধি, কত শত স্থানে, কত শত শোক সভা করা হইল। শোক প্রকাশক টেলিগ্রাম ও পত্র স্তূপীকৃত হইল। কত সংবাদপত্র এক মাস শোক-চিহ্ন ধারণ করিল। কত শোক-গাথা, কত শোক-কবিতা কত জীবনী যে প্রকাশিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজী, বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী ...র্দ্দু ইত্যাদি ভাষার এক খানিও সংবাদ পত্র এরূপ ...ল না, যে ইঁহার জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করে ...ই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁহার জন্য অশ্রুপাত ...রিয়াছিল।

নানা স্থানে ইঁহার স্মরণ-চিহ্ন স্থাপন করিবার প্রস্তাব ...। আমাদের দেশের মত হতভাগ্য দেশ বোধ হয় ...: আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাস ক্ষণিক। উচ্ছ্বাসের সময় ...হয়, কত কি করিয়া ফেলিব, কিন্তু দু'দিন পরেই ...কিছুই মনে থাকে না। ইঁহার স্মরণ-চিহ্নের জন্য ...কে অনেক কাজ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা নাম ...। প্রকৃত স্মরণ-চিহ্ন যদি কিছু থাকে ত তাহা উদয়-...রের "হরিশ্চন্দ্র স্কুল"; উহা অদ্যাবধি চলিতেছে এবং ...র্থিক সচ্ছলতা বশতঃ স্থায়ী হইবার আশা করা যাইতে ...পারে। কাশীতে ইঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়টীর নাম পূর্ব্বে "চৌক স্কুল" ছিল, ইঁহার মৃত্যুর পর রাজা শিব প্রসাদের প্রস্তাবে ও কাশীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এডামস সাহেবের অনুমোদনে উহার নাম "হরিশ্চন্দ্র স্কুল" হয়। লাহোরস্থিত হিন্দী পত্র "মিত্র বিলাসে"র আগ্রহে ইঁহার নামে সম্বত (সন, অব্দ,) প্রচলিত হয়। কিছু দিন হিন্দী শিক্ষিত সমাজে উহার খুব আদর হইয়াছিল। এখন ততটা নাই, কালে বোধ হয় কিছুই থাকিবে না। (সমাপ্ত)

প্রবাসিনী।

মৃত্যু।

সখা, কেমনে বুঝাব সবারে
নিখিল ভুবনে নীরবে গোপনে
ভালবাস কত আমারে!
জীবনের যবে বেড়ি' চারি ধার
উথলে নিরাশা দুখ-হাহাকার,
তখনো কেমন আদরে অপার
জ্বাল দীপ তুমি আঁধারে!
সবে যায় সরি' তুমি বুক ভরি'
ভালবাস শুধু আমারে!
সখা, কেমনে বুঝাব সবারে!

ওগো, সবারে দেখাব কেমনে
কিবা সুকুমার মূরতি তোমার
আঁকা সদা মোর নয়নে!
শিশির-সিঞ্চিত ফুলের হাসিতে,
শরৎ-চাঁদের জোছনা রাশিতে,
বুঝি এত শোভা আমার আঁখিতে
পড়ে নাই কভু জীবনে!
কি চোখে তোমায়, দেখেছি ধরায়,
ওগো, সবারে বুঝাব কেমনে।

সখা, কেমনে জানাব সবারে
তোমারি মতন, সরল-সুজন,
কেহ নাই ধরা মাঝারে!
তব স্নেহ-আঁখি সবাকার পরে,
রহে সম ভাবে চিরকাল ধ'রে,
না কর বিশেষ ঘৃণা কি আদরে
ছোট বড় বলি' কাহারে!
বিরাগ-ছলনা, তুমিত জান না,
বিশাল অবনী মাঝারে!
সখা, কেমনে বুঝাব সবারে!



আফগানাধিপতি আমীর হবিবুল্লা খাঁ।

ওগো, কি তুমি বাজাও বাঁশরী,
সকলে যে হায়, ছুটে চলে যায়,
শোক-তাপ সব পাশরি!
কিবা মধুমাখা মোহময় স্বর,
তাহারি মাঝারে রহে ভরপুর,
সকল বাঁধন হয়ে যায় চুর
নিমেষ না যেতে আ' মরি!
বুঝি-শ্যাম রায়, এমনি কোথায়,
হরেছিলা মন রাধারি!
ওগো, কি তুমি বাজাও বাঁশরী!

সখা, তোমারে না চিনে যাহারা
কহে নিরদয়, যাতনা-নিলয়,
মরুভূমি যথা সাহারা!
তুমি তাহাদের ভয় আর ভুল,
দূর করে দিয়ে পুলকে বিপুল
ঢাল অমরার সুষমা অতুল,
নীরবে করিয়ে ইসারা!
অকারণে তারা, কেঁদে হয় সারা,
দুয়ারে বসায় পাহারা!
সখা, তোমারে না চিনে যাহারা!

ওগো, তুমি যে আমার সকলি,
তুমি যে উদার, মহান উদার,
জানি আমি তোমা কেবলি!
জগতের ঘৃণা, জগতের দুখ,
সহি অকাতরে চাহি তব মুখ,
জীবনের মোর আছে এক সুখ—
সখা ডেকে তোমা বিভলি!
কবে তব পায়, দিব আপনায়,
ভাবি আমি তাই কেবলি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভারতে আমীর।

গত ডিসেম্বর মাস হইতে আফগানিস্থানের অধিপতি আমীর হবিবুল্লা খাঁ ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন। আমীরের সহিত আমাদের ব্রিটিসরাজের বিশেষ সম্বন্ধ। এসিয়া খণ্ডে ইংরেজের প্রধান শত্রু রুশ, আমীরের রাজ্য রুশ ও ইংরেজ উভয়ের অধিকারের মধ্যে অবস্থিত, এই জন্য ব্রিটিস ও রুশ উভয় শক্তিই আমীরকে হস্তগত রাখিতে প্রয়াসী। ভারত গবর্ণমেণ্ট আমীরকে প্রীত রাখিবার জন্য ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ভারতের রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর তাঁহাকে আঠার লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। এই অর্থের সাহায্যে আমীর আপনার সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিয়াছেন, অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধোপযোগী নানা অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টেরই ব্যয়ে আমীর এদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, আদর আপ্যায়িত করিয়া আমীরকে সন্তুষ্ট করিবেন, এবং তাঁহার রাজ্যে ইংরেজগণকে বাণিজ্যাধিকার ও অন্যান্য অধিকার প্রদান করিতে সম্মত করিবেন। আমীরকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। স্বরাজ্যের ক্ষতি হয় এমন কোন প্রস্তাবে তিনি সহজে সম্মত হইবেন, কিছুতেই এরূপ মনে হয় না। জাপানের জয়ে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে নব-জাগরণের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। এসিয়ায় বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে একতা স্থাপনের প্রয়াস ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমীর রুশ-জাপানের যুদ্ধকালে বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আমীরের অন্তর অবশ্যই এদেশের দুর্গতি দেখিয়া ব্যথিত হইয়া থাকিবে। দিল্লীতে ঈদ উপলক্ষে তিনি যে দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমীর যে অতি উদার, নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া স্বরাজ্যের উন্নতিকামী তাঁহার ঈদ দরবারের বক্তৃতা পাঠ করিলে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

আমরা "সোলতান" হইতে সেই বক্তৃতার কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি অদ্য মহানগরী দিল্লীতে ঈদের নমাজ পড়িতে পারিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিশেষ সুখের বিষয় যে আমি স্বীয় বন্ধুর রাজ্যে নমাজ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। আরও আনন্দের বিষয় যে আমি বহু-সংখ্যক স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত পবিত্র ঈদের নমাজ পড়িতে সক্ষম হইয়াছি। সমবেত হিন্দুগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অফগান রাজ্যে আমার ঈদ দরবারে অন্যূন ৬০। ৭০ জন উচ্চদরের সম্রান্ত হিন্দু যোগ দিয়া থাকেন। আমি অতি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে দরবারে গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি এবার গো কোর-বানী (জবাই) বারণ করিয়া দিয়াছি। যেহেতু আমি ইহা ইচ্ছা করি না, যে অনর্থক হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তরে আঘাত প্রদান করা হয়। উষ্ট্র, ছাগ, দুম্বা প্রভৃতি দ্বারাও যখন কোরবানীর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তখন গো কোরবানী করিয়া অন্যের প্রাণে আঘাত প্রদানের প্রয়োজন কি?

মবাশ দর্ পয়ে আজার, হারচে খাহিকুন্।
কে দর তরিকতেমা, গয়ের আজিঁগুনাহেনেস্ত ॥

অর্থাৎ কাহারও মনোকষ্ট দেওয়ার জন্য প্রয়াসী হইও না, আর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, যেহেতু আমাদের ধর্ম্মমতে ইহা অপেক্ষা পাপজনক কোন কাজ নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি সংবাদ পত্রিকাদি পড়িয়া থাকি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত এরূপ সংবাদ পাঠ করিয়াছি যে, ভারতের স্থান বিশেষে মুসলমানগণ গো-মস্তক হিন্দুর ধর্ম্মমন্দিরে এবং হিন্দুগণ শূকর-মস্তক মুসলমানগণের মসজেদে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। হিন্দু মুসলমান একই দেশে অবস্থান করেন। বড়ই সুখের বিষয় যে গবর্ণমেন্ট উভয় সম্প্রদায়কে ধর্ম্ম কর্ম্মে স্বাধীনতা দিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দেশগত স্বার্থ ও বাণিজ্য প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যে পরস্পর সম্পর্ক অনিবার্য্য। ঐরূপ একতা ও সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের উপকার আছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও পক্ষে এরূপ কোন কাজ করা উচিত নহে যাহাতে এক পক্ষের ব্যবহারে অন্য পক্ষের মনোকষ্ট হইবার কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন, আপনারা আমার প্রজা নহেন, কর্ম্মচারীও নহেন, কিন্তু আমি ভ্রাতৃভাবে এবং নৈতিক মর্য্যাদার অনুরোধে এক কথা বলিবার অধিকার রাখি, যে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্দ সংরক্ষিত হওয়া সঙ্গত। এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত পারসী কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন।

গর্ ন আয়েদ বগোশে লগ্‌বতেকস্।
বর্ রসুলাল বলাগ বাসদওবস্ ॥

অর্থাৎ যদি (আমার কথা) কেহ সাগ্রহে গ্রহণ না করে তাহা হইলে আমার কোন দুঃখের কারণ নাই, যেহেতু (পত্র) পঁহুছানই বাহকের কর্ত্তব্য কার্য্য। সার মর্ম্ম এই যে আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা আমি আপনা-দিগকে বলিলাম, যদি আপনারা তাহা গ্রহণ না করেন তজ্জন্য আমার কোন দায়িত্ব থাকিল না, কারণ পত্র-বাহকের কর্ত্তব্য কার্য্য পত্রখানি গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া, পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করান তাহার কার্য্য নহে।

আলাপ প্রসঙ্গে তিনি কাবুলের কারখানা সমূহের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলিলেন, কাবুলে কামান, কর্ত্তুস, মুদ্রা ও বন্দুক নির্ম্মাণ প্রভৃতির কারখানা আছে। একজন হিন্দু ভদ্রলোক বলিলেন, আপনি কারখানা সমূহকে অতি সূক্ষ্ম ভাবে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। আমীর বলিলেন, আমি কেবল সখ করিয়া কল কারখানা দেখিতে যাই না, তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যেই অনেক কারখানা দেখিতে পারা যায়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, আমি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার রাজ্য ও প্রজাবর্গের উপকারার্থে যে যে কারখানা স্থাপন করিবার আবশ্যক হইবে তাহা করিতে প্রয়াস পাইব, ইহাই আমার প্রধান লক্ষ্য।"

ভারত-ভ্রমণ দ্বারা আমীর যে অভিজ্ঞতা লাভ করি-বেন কাবুলে ফিরিয়া গিয়া তাহার সাহায্যে স্বরাজ্যের বিবিধ কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবেন, ইতিমধ্যেই তাহার

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কাবুলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য ইতিমধ্যেই প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমগ্র আফগান রাজ্যকে ৪০টী শিক্ষা-কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে অবিলম্বে এক একটী নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য সমাপ্ত করিবে তখন তাহাদের জন্য কুড়িটী বা ততোধিক উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল ছাত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাবুল রাজ্যে দুইটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্ত্তমান হবিবিয়া কলেজে তখন এম, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখন হইতে তিন বৎসর পর কাবুলের প্রধান প্রধান সমস্ত সহরে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজধানীতে হিন্দুদিগের নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। হবিবিয়া কলেজের সংশ্রবে একটী অনুবাদ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আফগানিস্থানের মাতৃ-ভাষায় বিবিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এই বিভাগ হইতে অনুবাদিত হইবে। নানা স্থানে শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এপ্রিল মাসেই একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইবে। জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষা লাভ করিবার জন্য এক দল আফগান যুবককে সুশিক্ষিত করা হইবে। রাজকীয় ব্যয়ে তাহারা ঐ সকল দেশে শিক্ষা লাভ করিবে। আফগানিস্থান পর্ব্বত-বহুল দেশ, বহুল খনিজ ধাতু-রত্নের আকর-ভূমি, কিন্তু শিক্ষার অভাব বশতঃ সেই সকল ধাতু-রত্ন খনিগর্ভেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। অবিলম্বে কাবুলে খনিজ বিদ্যাশিক্ষার জন্যও একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।*

সুতরাং আশা করা যায়, বর্ত্তমান আমীরের অধীনে আফগান জাতি ধীরে ধীরে এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবে। জাপান জাগিয়াছে, চীন ও পারস্য জাগিতেছে, আফগানও জাগিবার আয়োজন করিতেছে, এসিয়ায় ঘুমঘোর বুঝি এবার ভাঙ্গিবে।

* বর্ত্তমান সময়ে আফগানিস্থানে শিক্ষার অবস্থা কত দূর হীন, ভারত-মহিলার বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী-লিখিত "কোহেবালের কামিনী" প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। ভাঃ মঃ সঃ।

ভারত-নারীর শিক্ষা।*

এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও প্রকাশ্য সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মন্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইতেছে, ইহা যেন যুগপৎ বিদ্রূপাত্মক ও দুঃখজনক দুর্ব্বোধ রহস্যের মত বোধ হইতেছে। প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভেই যে ভারত সভ্যতার অতি উচ্চ সোপানে আরূঢ় ছিল, আশ্চর্য্য প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানানুশীলনে যে দেশের নারীগণ জগতের সভ্যতার স্রোতকে শক্তিশালী করিতেছিলেন, সে দেশে এরূপ ব্যাপার কি বিদ্রূপপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না? কিন্তু অবস্থা চক্রে, দৈব বিড়ম্বনায়, যখন এই লজ্জাকর দশা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শুধু শূন্যগর্ভ মন্তব্য নির্দ্ধারণ মাত্র না করিয়া বৎসরের পর বৎসর স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে প্রসার লাভ করে সেই উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। এই জাতীয় অভ্যুত্থান-চেষ্টার সময়ে—ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহ যখন একই জাতীয় আদর্শের অভিমুখে চলিতে চেষ্টা করিতেছে—সেই মহা প্রয়াসের সময়ে আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য, যে সকল আন্দোলনের ফলাফলই নারীজাতি বিষয়ক প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কারণ, হে ভারতের পুরুষগণ, জাতি-গঠনের ভার আপনাদের উপর নহে—সে ভার আমাদের হস্তে—নারীজাতির হস্তে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী সথিয়ানাধন যখন "ইণ্ডিয়ান ল্যাডিজ ম্যাগাজিন" পত্রিকা প্রকাশিত করেন তখন সেই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নানারূপ আলোচনা উপস্থিত হইয়াছিল। নারীগণ এক বাক্যে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল।

* ভারতীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতির অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। ভাঃ মঃ সঃ।

অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন, "নারীগণের আবার বিদ্যাশিক্ষা কি? তাহা হইলে যে আমাদের গৃহের সুখ ও আরাম বিনষ্ট হইবে, নারীগণ রন্ধনকার্য্য পরিত্যাগ করিবে!" কেহ কেহ আবার মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিষয়ের নাম করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "নারীদিগকে এগুলি শিক্ষা দাও, ওগুলি শিক্ষা দিও না।" কিন্তু হে বন্ধুগণ, শিক্ষা বিষয়ে আপনারা কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ভগবানের রাজ্যে বায়ুকে যেমন বলিতে পারেন না যে, "হে বায়ু, তুমি যথা ইচ্ছা প্রবাহিত হইও না," সমুদ্র-তরঙ্গকে যেমন সীমা অতিক্রম করিতে নিষেধ করিতে পারেন না, তেমনি মানবাত্মাকে মানবীয় স্বেচ্ছাচার-নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতে আপনারা নিবারণ করিতে পারেন না। কতকগুলি বিষয়ে উপার্জ্জিত জ্ঞান-সমষ্টিকে মাত্র আমি শিক্ষা বলিতেছি না, মানব-মনের বিকাশের উপযোগী সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সর্ব্ব-দিক-প্রসারী যে অনুশীলন আমি তাহাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করিতেছি। মানুষ কি মানুষকে তাহার আজন্ম-লব্ধ স্বত্ব বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সাহসী হয়? মানুষ তবে কি প্রকারে অপর মানবাত্মাকে তাহার অনন্ত কালের [অ]ধিকার জীবন ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবে? [ত]থাপি, হে বন্ধুগণ, ভারত-নারীর প্রতি পুরুষগণ এই প্রকার দুর্ব্যবহার করিতে ভীত হয় নাই। হে ভারতের পুরুষগণ,এই জন্যই আজ আপনাদের এই দশা। আপনাদের পিতৃগণ আপনাদের মাতৃগণকে তাঁহাদের আজন্মলব্ধ স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া আজ আপনাদিগকে—তাঁহাদের সন্তানগণকে—আপনাদিগের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। আপনারা তাঁহাদের প্রাচীন স্বত্ব তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতিগঠনের প্রকৃত ভার আমাদেরই হাতে, আপনাদের হাতে নহে। আমাদের সাহায্য ব্যতীত আপনাদের সকল উন্নতি-চেষ্টা, আপনাদের সকল কংগ্রেস ও কনফারেন্স ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নারীগণকে সুশিক্ষা দিন, জাতি আপনিই গড়িয়া উঠিবে, কারণ, "যে হস্ত শিশুর দোলনায় দোল দেয় সেই শক্তিই জগৎ শাসন করে"—এ কথা কাল যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য আছে, এবং অনন্ত কালই ধ্রুব সত্য থাকিবে।

আহ্বান।

দেবি! বসি তৃণ আস্তরণে,
বিহ্বল আবেশে,
তোমারে দেখিতে চাই
নিমেষে নিমেষে।
মাথার উপরে মুক্ত
শান্ত ঘন-নীল,
চারি পাশে স্তব্ধতার
প্রাচীর গম্ভীর।
উন্নত হৃদয় ভাব,
উন্নত বাসনা,
মরে যাক্ লাজে ক্ষোভে
মলিন বাসনা।
শুধু তুমি শুধু আমি
পদতলে "তাঁর"—
দেহের বিকার-হীন
বিদেহী পিতার—
বসি এস দুই জনে।
দু'খানি হৃদয়ে
এ দেশের দুঃখ জ্বালা
যাই পাসরিয়ে;
দূরে থাক জগতের
দৈন্য কোলাহল,
দূরে থাক ম্লান তুচ্ছ
বাসনা চঞ্চল।
তটিনী ছুটিয়া যায়
সাগরের মুখে,
এস তুমি এক বার
উচ্ছ্বসিত বুকে,

অমৃত প্লাবনে দাও
ভরিয়া হৃদয়,
শুধু ত বিষাদময়
এ ধরণী নয়।

শ্রীসরলা দত্ত।

পরিবর্ত্তন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৫

অপরাহ্নে কালা দুইটি শিশু বালক ও বালিকাকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, ও তাহাদের বলিল, "পাঁচু সিধু, তোদের কাকা-বাবুকে পেরণাম কর।"

তৎপরে বিনোদকে বলিল, "দাদা-বাবু এই আমার ছেলে গো, এর নাম পঞ্চানন, আর এই মেয়েটি, মা এর নাম সিদ্ধেশ্বরী থুয়েছে। এরা বউমাকে আর খুকুমণিকে দেখবার তরে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।"

বিনোদ তাহাদের কাছে ডাকাতে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া বাপের নিকট সরিয়া গেল। শৈল অবাক হইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে লাল রংএর ডুরে কাপড় পরিয়াছে। সিধুর কপালে তৈল গড়াইতেছে, চুলগুলি খুব আঁটিয়া টানিয়া বাঁধা, কপালে একটি টিপ, নাকে রূপার নোলক, কানে বিলাতী মুক্তা দেওয়া দুটো মাকড়ি। হাতে কয়েক গাছি কাঁচের চুড়ি ও রূপার বালা, ও কোমরে একটি রূপার শিকলি ঝুলিতেছে, গলায় পদক।

সুখী চুপি চুপি বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে ত কিছু নেই, ছেলেদের কি দেব? কলিকাতা থেকে আসবার সময় পথে যে জলখাবার কিনেছিলে তাই আছে, ওদের কি তা দেব?"

বিনোদ ঘাড় নাড়িয়া সায় দেওয়ায় সুখী তাড়াতাড়ি সেই খাবার আনিয়া তাহাদের হাতে দিল। তাহারা সেই সাদা ধবধবে লুচি ও রসগোল্লা পাইয়া যে পরম আনন্দিত হইল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনি খাইতে আরম্ভ করিল না, লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কালা বিনোদকে ডাকিয়া বলিল, "দাদা-বাবু এস ত দুটো কথা বলি।"

বিনোদ উঠিয়া বাহিরে গেল। সুখদাও গৃহকার্য্যে মন দিল। ছেলে মেয়ে দুটি আহারে মনোনিবেশ করিল।

বিনোদ বাহিরে আসিলে কালার নিকট শুনিল, যে তাহাদের কিছু ধান বিক্রয় করিয়া কালা অতি আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় করিয়াছে, তাহা প্রায় ৮।১০ টাকার হইবে। কালা ৪টি টাকা আনিয়া দিয়াছে, আর বলিল, "দাদা-বাবু, এবার ফসলের পর বাকি শোধ করিব।"

বিনোদ বলিল, "কালা, এ টাকা আমার নেওয়া উচিত নয়, তবে ধান বিক্রি ক'রে হাতে কিছু টাকা হলে আমি আর এ টাকা নেব না। তোমায় আর বাকি টাকা দিতে হবে না। এখন আমি কি করিলে আমার পরিবার প্রতিপালন হয় তা বল। এখানে কি কোনও সুবিধার চাকরী পাব?"

কালা বলিল, "কেন দাদা-বাবু, চাকরী কর্ত্তে যাবে কেন? তোমার যা খেত আছে তাতে দুজনের মোটা ভাত কষ্টে সৃষ্টে হয়ে যাবে, তবে অন্য সব খরচের অকুলান হবে। তা তোমার দু গোলা ধান মজুত, এ বছরে বীজের ধান ও খাবার যুগ্যি রেখে সব বেচে ফেল, আর সেই টাকায় নূতন জমি ধর, একজন প্রজাকে লাগিয়ে দাও, না হয় দাদা আমাকেই দিও, আমি আর এক জনের সঙ্গে চাষ করব। তোমার তা হলে কোনই ভাবনা থাকবে না। এই ধানের সময় ধান, কড়াই, মুল, আবার আকের সময় ক্ষেত-ভরা আক কর্ব্ব, তোমার গুড়ের ভাবনা থাকবে না। সরষে, তিল সব হবে। তুমি শুধু একবার ক'রে খেত খোলা দেখতে যেও, আর কাজ সব আমি ক'রে দেব। এ পাড়াগাঁ বটে, কিন্তু জিনিষ পত্তর কত সস্তা। তোমার মার গোহালে যে গরু বাঁধা ছিল, মনে আছে তার বাছুর দুটো ছিল? এখন তারাই দুধ দিচ্ছে, তোমার দুধ পর্য্যন্ত কিনতে হবে না। ধান বিক্রি কল্লেই টাকা হবে, তাতে তোমার কাপড় চোপড়

করিও, ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবে দাদা? এখানে প'ড়ে থাক, সব ভাল হবে।"

বিনোদ এ পরামর্শ মন্দ বুঝিল না, তাহার বিষয়-বুদ্ধি কিছুই নাই, অথচ তাহার প্রাণে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা বড় প্রবল হইয়াছে, সে কালার হাতেই আপনার ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিল।

বিনোদ কালার পরামর্শ অনুসারে ধান বিক্রয় করিয়া আবার নূতন জমি ধরিল। আপনাদের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি কিনিয়া অভাব দূর করিল। সুখদা আপনার ক্ষুদ্র সংসারে মনোনিবেশ করিল। তাহাদের সেই সামান্য গৃহখানি তাহার স্পর্শে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে বুড়ীকে বেশী কাজ করিতে দিত না, শৈলই বুড়ীকে অধিকার করিয়া ফেলিল। বুড়ী শৈলকে কোলে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইতে বড় ভালবাসিত, আর মিত্তিরদের বিনোদ বাবুর মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার গর্ব্বের সীমা থাকিত না। পঞ্চানন ও সিদ্ধেশ্বরী আইমার সঙ্গে খুব বেড়াইত, তাহারা দুটীতে শৈলের বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল, বিনোদের বেশ আয় হইল, সে বছর জমিতে সোনা ফলিল। কৃষকেরা আশার অতীত ধন পাইল। বিনোদের আর আনন্দের সীমা নাই। সেই সুখ ও সৌভাগ্যের সহিত তাহার সংসারে আর একটি নূতন অতিথি আসিয়া সকলের হর্ষ বাড়াইয়া তুলিল। যে শিশু সন্তানের শোকে সুখদার হৃদয় জ্বলিতেছিল, সেইরূপ আর একটি শিশু আসিয়া তাহাদের হৃদয় জুড়াইল। বুড়ী খোকাটির নাম রাখিল হারাধন। সুখদা তাহাতে আপত্তি না করিয়া ডাক নাম হারাধন ও ভাল নাম অমূল্যকুমার রাখিল।

বিনোদের পরাধীন জীবনের অবসান হইয়াছে, সে এখন নিজের বুদ্ধিতে বেশ চলিতে শিখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুরে শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিত। এবার পূজার সময় শ্বশ্রূমাতাকে একখানি গরদের বস্ত্র ও পাঁচটী মুদ্রা প্রণামী বলিয়া পাঠাইয়া দিল, আর সেই সঙ্গে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইল।

মেদিনীপুরে সে পত্র, মুদ্রা ও বস্ত্র গিয়া পৌঁছিল, সে দিন গিরিশচন্দ্র আনন্দের সহিত গৃহিণীকে গিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ, তোমার জামাই কি পাঠিয়েছে?"

গৃহিণী উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কোন্ জামাই গো, বড় জামাই?"

গিরিশচন্দ্র। "হাঁ বড় জামাইয়ের ত তোমার জন্য ঘুম হচ্ছে না। সে এখন সরকারীতে বড় চাকরী করছে, তার এই গরীব শ্বশুর বাড়ীর পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়! তোমার মেয়ে মোক্ষদা তোমার খোঁজ নেয়?"

গৃহিণী সুখদার অবস্থা যে এত ফিরিবে, ছোট জামাই যে প্রণামী পাঠাবে, তা যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তবু বলিলেন, "তবে কি বিনোদ পাঠিয়েছে?"

গিরিশচন্দ্র। "হাঁ গো, বিনোদই পাঠিয়েছে, সে যে মূর্খ তাই তার ভক্তি শ্রদ্ধা এখনো আছে, এই নাও তোমার গরদ—"

গৃহিণী চমকিত হইয়া বলিলেন, "গরদ কি গা?"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "এই গরদ আর পাঁচ টাকা প্রণামী পাঠিয়েছে।"

গৃহিণী গরদখানি হাতে লইয়া বলিলেন, "আবার প্রণামী?"

কর্ত্তা বলিলেন, "হাঁ প্রণামী, আরও সুসংবাদ আছে, শুনবে কি?"

গৃহিণী ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "কি সংবাদ বল না গা।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তবে এই শোন বিনোদের চিঠিঃ—

"প্রণামান্তর নিবেদন—

অদ্য ডাক যোগে শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীর জন্য সামান্য বস্ত্র ও প্রণামী স্বরূপ কিছু পাঠাইলাম। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুখী করিবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও কল্যাণে আমাদের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। এই মাসে তাহার অন্নপ্রাশন হইয়াছে ও অমূল্যকুমার নাম রাখা হইয়াছে। শৈলবালা ভাল আছে। জগদীশ্বরের কৃপায় সকল দিকে মঙ্গল হইলে আগামী বর্ষে আমরা গিয়া আপনাদিগের চরণ দর্শন

করিয়া কৃতার্থ হইব। আমাদিগের বিনীত প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও শ্বশ্রুমাতা-ঠাকুরাণীকে জানাইবেন। নিবেদন ইতি—

সেবক

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র।"

গৃহিণী সেই শুভ সংবাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "সুখী আমার যে এখন নিজের ঘরে সুখে আছে এর চেয়ে আর কি চাই? তখন তুমি লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ বলে কত কথা শোনালে, সেই লক্ষ্মীছাড়ার ব্যবহার দেখলে ত? মোক্ষদা গরিবের মেয়ে বলে এই আজ সাত আট বছর বিমলাচরণ তাকে পাঠায়নি। কেন না, তিনি হাকিম হয়েছেন। আমার মূর্খ জামাই ভাল।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "এখন ত বলবেই, তখন অমন না হলে, অমন কথা না বললে কি নিজের চেষ্টা হ'ত? নিজের চেষ্টা না হ'লে অন্যে কেউ কিছু করাতে পারে না। সে তার ভিটেয় ফিরে গেল, তার ভাল হ'ল। এখানে প'ড়ে প'ড়ে কি কচ্ছিল? মেয়ে জামাইয়ের সুখ হলেই আমাদের সুখ।"

জগতে নিয়মই এই, অবস্থার পরিবর্ত্তনে মতের পরিবর্ত্তন হয়। (সমাপ্ত)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নব নারী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

দুর্গাবতী।

রাণী দুর্গাবতী আকবর শাহের সমসাময়িক। এই প্রাতঃস্মরণীয়া বীর-নারী বুন্দেল খণ্ডের প্রাচীন রাজধানী মাহোবার অধিপতির কন্যা। দুর্গাবতী অসাধারণ রূপবতী ছিলেন; নারীজনোচিত কমনীয় গুণরাজি তাঁহার ভূষণ স্বরূপ ছিল। গড়মণ্ডলের ভূপতি দলপত শাহ এই রমণী-রত্নের পাণিপ্রার্থী হন। গড়মণ্ডল রাজ্য পবিত্রসলিলা নর্ম্মদার তীরে প্রতিষ্ঠিত এবং সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু উহার রাজ-বংশের তাদৃশ সামাজিক মর্য্যাদা ছিল না। মাহোবার অধিপতি অতি সম্ভ্রান্ত রাজপুত-বংশ-সম্ভূত ছিলেন; এ কারণ বড় গৌরব অনুভব করিতেন। তিনি বংশ-গৌরব নাশ ভয়ে দলপত শাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তার পর তিনি বলিয়া পাঠান, যদি দলপত শাহ বাহুবলে দুর্গাবতীকে আমার ভবন হইতে হরণ করিয়া তাঁহার পাণি-পীড়ন করিতে পারেন, তবে আমি প্রীতিলাভ করিব। দলপত শাহ তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সৈন্য-বলও যথেষ্ট ছিল। তিনি ঐ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ মনোমোহিনী দুর্গাবতীকে লাভ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। প্রবল যুদ্ধে দুর্গাবতী-রত্ন লাভ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। তেজস্বিতার সহিত তেজস্বিতা মিলিত হইল, সুখের সীমা রহিল না। অদ্যাপি মধ্যভারতে দুর্গাবতীর নাম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, গড়মণ্ডল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের রাজন্য-কুলে আর কেহই রাণী দুর্গাবতীর তুল্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়মণ্ডল রাজ্য দৈর্ঘ্যে তিন শত মাইল ও প্রস্থে এক শত মাইল ছিল। সমগ্র রাজ্য ধন-ধান্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, গড়মণ্ডল রাজ্যে ৭০ হাজার পল্লী ও নগর ছিল। গড়মণ্ডল রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-কাহিনী আকবর শাহের অন্যতম ওমরাহ আসফ খাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বিপুল মোগল-বাহিনী লইয়া গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই সময় দলপত শাহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এবং তদীয় বিধবা মহিষী দুর্গাবতী অপরিণত বয়স্ক পুত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ শাসন কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তেজস্বিনী দুর্গাবতী আসফ খাঁর আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার গতিরোধ জন্য বীর-দর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। আট হাজার অশ্বারোহী এবং ততোধিক পদাতিক সৈন্য দেড় সহস্র রণহস্তী সহ তাঁহার সাহায্যার্থ সজ্জিত হইল। বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার যোদ্ধ-বেশ, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, হস্তে শাণিত বর্শা, পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ দেখিয়া লোকে ভয়ে

ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িল; সৈন্য মধ্যে মহোৎসাহের সঞ্চার হইল। স্বদেশানুরাগের সহিত বীর-নারীর উদ্দীপনা মিলিত হইয়া সৈন্য বৃন্দকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া তুলিল। মোগল সৈন্য ক্রমান্বয়ে দুই বার দুর্গাবতীর হস্তে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল; ছয় শত প্রাণশূন্য মোগল সৈন্য রণক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া মোগল-বাহিনীর দুর্দশার পরিচয় দিতে লাগিল। বিজয়-শ্রী-শালিনী রাণী দুর্গাবতী শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার জন্য সংকল্প প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তদীয় মন্ত্রীগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ক্লান্ত সৈন্যের বিশ্রামের জন্য অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া রাণী অগত্যা ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। এক দিকে রাণী দুর্গাবতী সসৈন্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অপর দিকে মোগল সেনাপতি ঘোর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ ও নষ্ট গৌরবের উদ্ধার সাধন জন্য নবাগত সৈন্যসহ নবতেজে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাণী দুর্গাবতী শত্রুর পুনরাগমন সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাহাদের গতিরোধ জন্য একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আসফ খাঁ কামান লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণে হিন্দু সৈন্যের সমস্ত পরাক্রম ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। রাজকুমার বীরনারায়ণ শত্রু-হস্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে আহত হইলেন। তেজস্বিনী রাণী প্রাণাধিক পুত্রের তাদৃশ বিপদাপন্ন অবস্থা দেখিয়াও অবিচলিত রহিলেন; আহত পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিয়া অমিত পরাক্রমে শত্রুসৈন্য মন্থন করিতে লাগিলেন। তদীয় সৈন্যগণ রাজকুমারকে আহত দেখিয়া নিরুৎসাহ হইল, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাণী দুর্গাবতী এই ভাগ্যবিপর্য্যয়েও অবিচলিত রহিলেন, কেবলমাত্র তিন শত সৈন্য লইয়া প্রবলোৎসাহে অসম সাহস সহকারে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিছুতেই এক পদও পশ্চাৎপদ হইলেন না। শত্রুহস্ত-নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল; তিনি স্বহস্তে ঐ শর উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার একাংশ চক্ষুর অভ্যন্তরে লাগিয়া রহিল। ইহার পর আর একটি শর আসিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশে বিদ্ধ হইল। এই উভয় স্থানের যন্ত্রণায় তাঁহার নিকট চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল; তিনি হস্তীপৃষ্ঠে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। জয়াশা তিরোহিত হইল। একজন বিশ্বস্ত পরিচারক তাঁহাকে রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তিনি অবজ্ঞাভরে এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি আত্মসম্মানও বিসর্জ্জন করিতে হইবে? আমরা এতদিন যশঃ ও মর্য্যাদা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছি; এখন কি ঘৃণ্য জীবনের জন্য সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত যশঃ ও মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিব? যদি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার বর্ষার আঘাতে আমার জীবনান্ত কর, তাহা হইলে আমাকে আর আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না।" রাণীর বাক্যে পরিচারক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এদিকে শত্রুকুল তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী শত্রুহস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায় সহসা পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারকের কোষ হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া স্বীয় হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল। এই সময় ছয়জন মহাবীর রাণীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন; তাঁহারা রাণীর এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ দেখিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একে একে ছয় জনেই শত্রু নাশ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ণেল স্লিম্যান লিখিয়াছেন যে, দুই গিরির মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে রাণী দুর্গাবতীর প্রাণ বিসর্জ্জনের স্থান অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পথিকগণ এই নির্জ্জন স্থান অতিবাহিত করিবার সময় তথায় স্বর্গীয়া দুর্গাবতীর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে স্ফটিক অর্পণ করিয়া

206(A)



কুমারী কৈজি।

206(A)

থাকে। এই স্থানের চতুস্পার্শ্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ স্ফটিক পাওয়া যায়।

(৭)

যোধপুর-মহিষী।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ শাহজাহান সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হন। এই সময় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারা রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ রাজকুমারগণ মধ্যে সুজা বঙ্গদেশে, আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে এবং মুরাদ গুজরাটের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাসী রাজকুমারগণ পিতার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হ'ন। দারা আওরঙ্গজেব ও মুরাদের গতি রোধ করিবার জন্য যোধপুরের মহারাজ যশোবন্তের সৈনাপত্যে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। চম্বল নদীর তীরে সামগড় নামক স্থানে উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইলে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিজয়লক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, যশোবন্ত সিংহ বহু যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদে তদীয় তেজস্বিনী মহিষী নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত সিংহ যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে মহারাণী তাঁহার তথা-কথিত কাপুরুষতায় রাগান্ধ হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দূতগণ আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজা অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন; তার পর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া স্বসৈন্যের অযথা রক্তপাত নিবারণ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র ৪।৫ শত অনুচর সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই প্রবোধ বাক্যে তেজস্বিনী মহারাণীর ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্তভাব ধারণ করিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ যশোবন্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বংশে,—উদয়পুরের রাজবংশে—বিবাহ করিয়াছেন, বীরকুলবরেণ্য রাণার জামাতা কখনও এতাদৃশ হীনমতি হইতে পারেন না। মহারাজা চিরপূজ্য রাজবংশের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া সে বংশের অনুকরণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। মহারাজ রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলেই আমি প্রীতি লাভ করিতাম।" ইহার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মহারাণী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "তোমরা মিথ্যাবাদী,—মহারাজা কখনও শুভ্র যশোরাশিতে কলঙ্ক লেপন করেন নাই। তিনি নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। আমি সহমরণে যাইব, তোমরা সকলে চিতা সজ্জিত কর।" ইহার পরমুহূর্ত্তেই পুনর্ব্বার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি মহারাজার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ভৎর্সনা সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ এক ভাবের পর আর এক ভাব উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই ভাবে সপ্তাহাধিক অতীত হইলে তদীয় মাতা আগমন পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করেন। তৎপর মহারাণীর পতিভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল; তিনি মহারাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মিলনান্তে মহারাজ যশোবন্ত রাজধানীতে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃকুল নির্ম্মূল করিয়া দিল্লীর রাজতক্তে আরোহণ করিলেন। নবাভিষিক্ত সম্রাট মহারাজ যশোবন্তকে সাদরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ যশোবন্ত রাজকার্য্যানুরোধে কাবুলে গমন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজার লোকান্তর ঘটিল। তৎকালে মহারাজার মহিষীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মহারাজার পরলোকগমনের পর তিনি পুত্রদ্বয় সহ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মতিচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব দিল্লীতে তাঁহাদের শিবির অবরুদ্ধ করিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিলে তিনি যে কৌশলে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাহা তাঁহার প্রখর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। রাণীর কতিপয় অনুচর কার্য্যব্যপদেশে স্বদেশে গমন করিতে বাদশাহের অনুমতি লাভ করে। তাহাদের যাত্রার প্রাক্কালে রাজপুত্র দ্বয়ের সমবয়স্ক দুইজন বালক রাজভূষণে ভূষিত হইল, এবং একজন সঙ্গিনী রাজপুতরমণী রাণীর বেশ পরিধান করিল। ছদ্মবেশ ধারণের পর ইহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া রাণী

প্রহরীগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাজপুত্রদ্বয় ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজপুতনায় পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পলায়ন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে পাঁচ সহস্র মোগল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাস বিপুল পরাক্রমে মোগল সৈন্যকে একটি গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ করিলেন; ইত্যবকাশে মহারাজ যশোবন্তের মহিষী নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

কোহেবালের কামিনী।

(শেষ প্রস্তাব)

কাবুলের রমণী-সমাজ মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে সেখানে দুই একজন কোরাণ সরিফের দুই একটা "আয়েৎ" (শ্লোক) মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারাও লিখিতে জানে না। কেহ কেহ কোরাণ পড়িতে পারে, কিন্তু কোরাণ ভিন্ন এবং বর্ণমালা পুস্তকের প্রথম ভাগ ভিন্ন অন্য গ্রন্থ পাঠ করে বলিয়া বোধ হয় না। লোকে কথায় বলে—

কালি কলম মন।
লেখে তিন জন॥

আফগান দেশের স্ত্রীলোকগণের সহিত কালি বা কলমের কোন সম্পর্ক নাই; লেখা পড়া শিক্ষা করিবার মন (প্রবৃত্তিও) নাই, সুতরাং লেখা পড়ার দফা একেবারেই রফা! স্ত্রীলোকগণ বিদ্যাবতী হউক, পুরুষগণেরও তাহা আদৌ ইচ্ছা নহে। আফগান দেশে প্রকৃত পণ্ডিতও নাই, সুতরাং মা সরস্বতী কেবল রমণী-সমাজে নহে, পুরুষ-সমাজেও একেবারে অদৃশ্যা হইয়া আছেন। যদি কেহ সমুদয় কোরাণ পড়িয়া তাহা মুখস্থ করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে "হাফেজ" কহা হয়; এদেশে হাফেজের মহা সম্মান। কেবল মুখস্থ করিতে পারিলেই যথেষ্ট, শ্লোকের একটা অংশেরও অর্থ না জানিলে ক্ষতি নাই। যাহারা কিয়দংশের অর্থ করিতে সক্ষম, অথবা তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে সমগ্র কোরাণের অর্থ বুঝিয়া আইসে, তাহারা অবশ্য দেবতার তুল্য শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফল কথা এই, কোরাণ ভিন্ন পুরুষ-সমাজেও লেখাপড়ার প্রকৃত চর্চ্চা নাই; স্ত্রী-সমাজ একেবারেই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

কাবুলের কামিনীর হাতের রন্ধন বাঙ্গালীর পক্ষে অতীব অসুবিধা জনক। রোটি ভিন্ন আর কোন দ্রব্য বাঙ্গালীর জিহ্বায় রুচিকর হয় না। কিন্তু রোটিও এমন পুরু (মোটা) এবং কঠিন হয়, যে বঙ্গবাসীর পক্ষে তাহা ভোজ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আফগান-দিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত সৌখীন তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা রোটী প্রস্তত করিলে রোটি অপেক্ষাকৃত নরম হয় বটে কিন্তু ওজনে ও আকারে কম হয় না; এরূপ রোটীও ভক্ষণ করিলে বাঙ্গালী ভায়া দুই চারি দিন মধ্যে কাবুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ডাউল (দাইল) এমন ঘন হয় যে তাহা ভাতের সহচর হইতে পারে না। মাংস যেরূপে প্রস্তত হয় তাহা বাঙ্গালীর দুর্ব্বল পাকাশয়ে সহজে জীর্ণ হয় না; শাক-সবজি অপেক্ষা এ দেশে মাংসের প্রচলন প্রচুরতর। ভাতের প্রচলন ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালেই ইহার ব্যবহার হয়। কেবল ভাত কেহই খায় না, রোটির সঙ্গে ভাত চলে। পোলাও ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে চাউলের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষ হইতে খিচুড়ি তৈয়ারী করিবার প্রথা শিখিয়া গিয়া তদ্দেশীয়া অনেক স্ত্রীলোক শীতকালে মধ্যে মধ্যে খিচুড়ী রশুই করিয়া থাকে। আফগানিস্থানে ফল মূল যথেষ্ট পাওয়া যায়, সুতরাং শাক সব্জি (আনাজ) অপেক্ষা ফল মূলের প্রচলন অধিক। অন্ন দ্রব্যের প্রচলন খুব কম, অনেক স্থানে একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাগী, ভেড়ী, দুম্বা, ভেড়া ও "রশিনী"র মাংস প্রধানতঃ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়; উষ্ট্র-মাংস পর্ব্বোপলক্ষে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; গাভী-মাংসের প্রচলন খুব কম।

স্ত্রীলোকেরাই পাক কার্য্য সমাধা করে, পুরুষদের সহিত পাকশালার সম্পর্ক নাই।

আফগান দেশে "স্ত্রী ভোজন" পর্ব্ব আছে। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কেহ কেহ কেহ পল্লীর স্ত্রীলোকদিগকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করাইয়া থাকে। অন্ততঃ দশ জনের অধিক স্ত্রীলোক একত্রিতা না হইলে "ভোজ" হয় না। কখনও কখনও দুই তিন শত স্ত্রীলোক একত্রে আহার করিতে বসে। এবম্প্রকার ভোজের সময় কোন পুরুষ তথায় উপস্থিত থাকিতে পারে না, কেবল স্ত্রীলোকদের দ্বারাই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। রমণীগণ একত্রিতা হইলে যেরূপে তাহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা এক প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব প্রথা বলিলেই হয়। প্রথমে বিধবা স্ত্রীলোকের দল, তদনন্তর কুমারীগণ, তাহার পরে সধবাবৃন্দ, তাহার পরে (সর্ব্ব শেষে) পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা স্ত্রীলোকের সম্প্রদায়। ভোজ্য দ্রব্য পরিবেশন করিবার প্রথাও এই,—প্রথমে বিধবা স্ত্রীলোক, তদন্তর কুমারী, তাহার পরে উপরি উক্ত আসনানুসারে পরিবেশন হইয়া থাকে। সকলেই এক সময়ে আহার করেন বটে কিন্তু ঐ প্রথামত পরিবেশন করিতে হয়। ভোজ্য দ্রব্যগুলি কিরূপে পরিবেশিত হইয়া থাকে, তাহাও জানা আবশ্যক, ইহাও অতীব কৌতুকজনক। ভোজ্যপাত্রে সর্ব্বপ্রথমে একটি করিয়া বৃহদাকার মিঠাই দেওয়া হইয়া থাকে। এই মিঠাই শর্করা হইতে প্রস্তুত হয়, অথবা ফল কিম্বা মাংস মিশাইয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মিঠাই খাওয়া শেষ না হইতে হইতে এক এক পেয়ালা "চা" বিতরিত হয়, তদন্তর রোটি, মাংস ইত্যাদি যাহা থাকে পরিবেশিত হয়। সর্ব্বশেষে ফল (মেওয়া) এবং আবার গরম "চা" দেওয়া হয়। আফগান দেশে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এই উভয় সমাজে "চা" নামক পদার্থের যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। এক একজন স্ত্রীলোক দিবারাত্রি মধ্যে দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বার চা খাইয়া থাকে। কেহ কেহ "কাফি" খাইতেও শিখিয়াছে। বালিকারা খুব কম পরিমাণে চা ব্যবহার করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কাবুলীদিগের মাতৃ-ভাষার নাম পশ্‌তু। এই ভাষা যেমন কর্কশ তেমনি কঠিন। স্ত্রীলোকেরা এই ভাষায় গান গাহিলে হাস্যরস ভিন্ন অন্যবিধ রস বা ভাবের উদয় হয় না। উভয়েরই গাহিবার প্রথা অতিশয় জঘন্য ও অবৈজ্ঞানিক। পাঠক-পাঠিকার কৌতুহল নিবারণ জন্য "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড হইতে কাবুলের কামিনীদিগের একটা পশ্‌তু গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

রাগিনী কানেংড়া।

ফজলে পরবদ্ দফো সীয়ানংরা।
লবোদে লশেংগা রফো হিনারংরা।
জৎগ-এ-মউল, জিনাবংশ্
কিপরুকে জাখেন্ হিরদ্ গার্
দশ্ নেগী উবো, ঝলে দফ্ শুনেরা।
হকুম ফজ্ করুদে রণ উশা
দখনে দিদড়ি অফ্‌গণৎ বা।
হিজ্ জৎগে আলুলা তালা
দস্তানে হিন্‌জর্ কেবিলা;
উরে তাকুরী মহম্মদ রা॥
দী দা দোশ্‌তোন্ মন্‌জীলেৎ
বহার শে কফাই জলুবো শিয়া।
বর্ তবাজো হায় দুশ্‌মন্ তকীয়া।
কর্দ্দন্ ইবুলী হীশ্‌ৎ।
পায় বোসে সয়ল্ অজ্ পা
অফ্‌গণৎ দেওয়ার্ রা॥

এই সকল গীত গাহিবার সময়ে স্ত্রীলোকেরা এমন বিকট চীৎকার করে, যে তাহা শ্রবণ করিলে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা হয়।

ভারতবর্ষীয় মুসলমান-স্ত্রীলোকদিগের যে সকল নাম থাকে কাবুলের কামিনীদিগেরও প্রায় সেই সকল নাম রাখা হয়। এদেশে স্ত্রীলোকেরা ভগবৎ-প্রার্থনা জন্য মসজিদে যায় না; তবে কেহ কেহ গমনাগমন করিয়া থাকে বটে। যাঁহারা দর্বেশিনী অর্থাৎ ফকিরানী হয় তাঁহাদের অর্দ্ধ সংখ্যা প্রায় পরিব্রজন করিয়া থাকে, এক চতুর্থাংশ দর্গা, আখড়া প্রভৃতি আশ্রমে বাস করে এবং বাকি অংশ মসজিদে জীবন যাপন করে।

ইঁহাদের মধ্যে পর্দ্দা প্রথার প্রচলন নাই। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র পর্দ্দা প্রথার যথেষ্ট প্রচলন আছে।

ভারতবর্ষীয় রমণীগণ অপেক্ষা কাবুলের রমণী সাহস, সামর্থ্য ও বীরত্বে শতগুণে শ্রেষ্ঠা, কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতায় ইহারা সহস্র গুণে হীনতর। কাবুলের যুবতী অল্পবয়সেই উগ্রপ্রকৃতি-সম্পন্না হইয়া উঠে এবং ৫০ বৎসর বয়সের পরে প্রায়ই তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্যা হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশ ভিন্ন অন্যবিধ দেশে ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না এবং রোটি ও মাংস খাইতে না পাইলে কোন প্রকারেই জীবন যাপন করিতে সমর্থা হয় না; এই কারণেই সাত্ত্বিকতা ইহাদের মধ্যে কম এবং রাজসিকতা ও তামসিকতা অধিক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শান্তি।

("আনন্দ মঠের" শান্তির উদ্দেশে)

১

অবলা রমণী-কুলে লভিয়া জনম
মহাশক্তি ধরেছিলে প্রাণে,
শান্তি আজি শান্তিধামে করিছ বিশ্রাম
জীবানন্দ আনন্দ-ভবনে।

২

ভাবিছ কি তোমরা গো দেবতা দম্পতি
আজি এই স্বদেশের তরে,—
করেছিলে যার তরে আত্ম বিসর্জ্জন
গৃহ সুখ ত্যজি অকাতরে?

৩

নবে বেঁধেছিলে নিরালায় প্রেমের কুটীর
হয়ে তুমি সুশীতল ছায়া,
ভেবেছিলে র'বে দোঁহে প্রাণে প্রাণে মিলি—
প্রেম-স্রোতে জীবন ঢালিয়া।

৪

বিধাতা লইলা দোঁহে অন্য পথে টানি,
পতি তব স্বদেশের তরে,
সন্তানের মহা মন্ত্রে, হইলা দীক্ষিত
মার কাজে সঁপি আপনারে।

৫

আনন্দে আনন্দ-মঠে করিলা আশ্রয়;
গুরু সত্যানন্দের আদেশ,
ফিরিবে না গৃহে কভু স্ত্রী-পুত্র হেরিতে
মার কাজ না হইতে শেষ।

৬

একা হ'লে, তবু প্রাণে লভিলে সান্ত্বনা
বীরজায়া বীরত্বে পতির,
তোমারো হৃদয়ে জাগে জ্ঞানের প্রতিভা
কেন তবে হইবে অধীর!

৭

"পতির ধর্ম্মেতে নারী চির অধিকারী
সুখে দুঃখে রবে সাথে সাথে,
গৃহ সাজাবার তরে, শুধু কি আমরা,"—
এই ভাব জাগিল তোমাতে।

৮

শুধু কি শোভিবে সতী ফুল-মালা গলে?
রমণীর অন্তরেতে বাস
করে না কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, নাহি কিরে বল?
শুধুকি আঁখির তৃপ্তি মোহন বিলাস?

৯

কাটিয়া মোহন বেণী, গৈরিক বসনে
আবরিয়া দেহ আপনার,
নবীন তাপসী-বেশে বাহিরিলে সতী
নারী-শক্তি করিতে প্রচার।

১০

মহাজ্ঞানী সত্যানন্দ, প্রতিজ্ঞা তাঁহার
ভুলাইলে নিজ প্রতিভায়,
এখনো অবলা বালা এত বল ধরে
মহর্ষি অবাক্ হয়ে চায়।

১১

মহাশক্তি ধর তুমি জানিয়া তোমায়
মহামন্ত্রে করিলা দীক্ষিত,
"বন্দে-মাতরম্" গানে মোহিলে জগত
এক তানে পতির সহিত।

১২

জননী জনম-ভূমি করিয়া উদ্ধার
সমর্পিলে স্বদেশীর হাতে,
পূর্ণ ব্রত, নব প্রাণ লভিয়া দুজনে
চলে গেলে শান্তিময় পথে!

১২

হের সেই জন্মভূমি কাঁদিছে আবার
"সন্তান" কি নিশ্চিন্ত রহিবে?
এস সতী! সাথে লয়ে জীবানন্দ স্বামী
"বন্দেমাতরম্" গান গাবে।

১৪

মহা মন্ত্রে বঙ্গবাসী হইবে দীক্ষিত
নারীও আদর্শ তব লয়ে,
দাঁড়াবে স্বামীর পাশে, নব প্রাণ ধরি'।
নব শক্তি জাগিবে হৃদয়ে।

শ্রীপ্রমোদবালা সেন।

সাধ্বী নগেন্দ্রবালা।

বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের আশ্রয়-স্থল হইবে এই আশা করিয়া বারবিলাসিনীগণ বহু চেষ্টায় অসহায় বালিকা-গণকে হস্তগত করতঃ তাহাদিগকে লালন পালন করে, এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আপনাদিগের পাপ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অর্জ্জিত অর্থ আপনারা গ্রহণ করে। এই হতভাগিনীগণ এই উদ্দেশ্যে কত বালিকার সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং এইরূপে সমাজের পাপভার কত বর্দ্ধিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুশিক্ষা দ্বারা যে সকল বালিকার জীবন সংসারে ও সমাজে আনন্দ ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে পারিত, বাল্যকাল হইতে তাহারা পাপের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া পাপস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সমাজ মধ্যে পাপ বিস্তার করে। চরিত্র সংশোধনের, সুস্থ জীবন যাপনের কোন সুযোগই এই চিরদুঃখিনীদিগের অদৃষ্টে ঘটে না। ঢাকা সহরে এই সকল অভাগিনী বালিকার উদ্ধারের জন্য কয়েক বৎসর হইল একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকটী বালিকা এই আশ্রমের সাহায্যে ভাবী নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইয়া এখন পবিত্র জীবন যাপন করিতেছে। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মল্লিক নামক জনৈক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। আপনার সমগ্র দেহমন ঢালিয়া তিনি ও তাঁহার পত্নী এই কয়েক বৎসর এই আশ্রমের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। সাধ্বী নগেন্দ্রবালা, শ্রদ্ধেয় শশী বাবুর পত্নী, উদ্ধারাশ্রমের মাতৃস্থানীয়া সেবিকা। উদ্ধারাশ্রমকে মাতৃহীন করিয়া গত ১লা ফেব্রুয়ারী ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন আমরা নিম্নে তাহার অধিকাংশ প্রকাশিত করিলাম।

"ঢাকা জেলার অন্তর্গত সানড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত গোস্বামী পরিবারে মা জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর কবীন্দ্র গোস্বামী এই বংশের আদিপুরুষ। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সম-কালীন ভক্তদিগের মধ্যে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন; পূর্ব্ববঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হন।

এই বংশে পূর্ব্বোক্ত সানড়াগ্রামে আমার মাতামহ শ্রীযুক্ত গোপিকামোহন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত উদার-প্রকৃতি ও দয়ালু-হৃদয় ছিলেন। বৈষ্ণব কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও মহাপুরুষ-গণ তাঁহার প্রেরিত ভক্ত, তিনি এই বিশ্বাস করিতেন, এবং সাধু মহাজনদিগকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ঈশাচরিত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন। আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর তিনি অনেক সময় তাঁহার সহিত ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গাদিতে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিতেন। একবার যখন তিনি গুরুতর পীড়ায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, আমার পিতৃদেব ও মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া গিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শ্রবণ করিতেন, এবং

মৃত্যুকালে আমার পিতা ও মাতার সহবাসে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার দয়া ও ভক্তি আশ্চর্য্য ছিল। কখন কখন দেখা গিয়াছে, যে স্নান করিতে গিয়া বস্ত্রখানি কোন দীন দুঃখীকে দিয়া গামছাখানি পরিধান করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। একবার শীতকালে এক দরিদ্র ব্যক্তি অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া একখানি বস্ত্র চাহিলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি তাহাকে দিয়া নিজে লেপের নীচে রহিলেন। এইরূপ কত সময়ে কত ঘটনায় তাঁহার আশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যের দুঃখ দেখিয়া তিনি কখনও স্থির থাকিতে পারিতেন না।

মা ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা। মার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন মা নিজগ্রাম হইতে পিতামাতা সকলকে ছাড়িয়া তাঁহার পিতৃস্বসার নিকট কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এড়িয়াদহ নামক স্থানে গমন করেন এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পিসিমার কাছে ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পিসিমা স্বীয় কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন ও পালন করিতেন। সম্পর্কিত আর এক পিসিমার নিকট মা নীতি বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এড়িয়াদহের স্কুলে মা লেখা পড়া শিক্ষা করেন। তিনি প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ১২৯০ সনে বৈশাখ মাসে মার বিবাহ হয়। বাবা তখন ৭০৲ বেতনে ঢাকার কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। বিবাহের পর মা কলিকাতায় গেলেন; বাবা ঢাকা হইতে মুন্সীগঞ্জে বদলী হইলেন। কয়েক মাস পরে মা মুন্সীগঞ্জে আসেন। এখানে মা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে বাবা ঢাকায় নববিধান সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাকে লইয়া উৎসবে যোগদান করেন।

অনন্তর বাবা আবার ঢাকায় বদলী হইয়া আসেন। এখানে আসিয়া নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন। মা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহার অনুগামিনী হন। এই সময়ে বাবার চাকরী ছাড়িতে ইচ্ছা হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'আমার আর এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না।' তদুত্তরে মা একদিন বলিলেন, "তুমি চাকরী ছাড়িবে বল, কিন্তু ছাড় না ত ?" এই কথা শুনিয়া বাবা অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া বলিলেন, "চাকরী ছাড়িলে বড় কষ্ট পাইতে হইবে, তুমি তাহা বহন করিতে পারিবে কি ?" মা আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মত হইলেন। এই সময়ে মার বয়স পোনর বৎসর মাত্র। বাবা কার্য্য ছাড়িবার পর মা কত দুঃখকষ্টে পড়িয়াছেন, কিন্তু চাকরী ছাড়াতে কখনও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে মা দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষিত হইবার পর বাবা যখন নিরামিষ আহার করিতেন মাও তাঁহার সহিত ৫।৬ বৎসর নিরামিষ ভোজনে সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমার পূর্ব্বে একটী ভগ্নী জন্মগ্রহণ করিবার পর মা মরণাপন্ন হওয়াতে আবার আমিষ ভোজন করিতে বাধ্য হন।

নিমতলিতে যখন বিধান-পল্লী উঠিয়া আসে তখন বাবা কতক অন্যের সাহায্যে, কতক ঋণ করিয়া একখানি বাড়ী তৈয়ার করিলেন। মা ঋণ করা অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিতেন, যে যৎসামান্য স্বর্ণালঙ্কার ছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এইরূপে প্রচারক-পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া দয়াময় পরমেশ্বরের অপার করুণা সম্ভোগ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে একাদশ বৎসর কাটাইলেন।

১৮৯৬ সনের জুন মাসে নারায়ণগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দাস তথাকার একটী অসহায়া বালিকাকে দুরবস্থায় পাইয়া ঢাকায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কোথায়ও তাহার স্থান না হওয়াতে বাবা তাহাকে আশ্রয় দেন। মাও তাহাকে যত্নের সহিত গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে পুলিশের লোক আর একটী বালিকাকে লইয়া আইসে। সে সময়ে বাবা বাড়ীতে ছিলেন না, এবং ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না। মা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে আশ্রয় দেন। পরে বাবা আর একটী কন্যাকে রাত্রি ১০।১১টার সময়ে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। মা তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং নিজের বিছানায় রাখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

এইরূপে দুই তিনটী বালিকা লইয়া উদ্ধারাশ্রমের সূত্রপাত হইল। ক্রমশঃ আরও বালিকা আসিতে লাগিল, একটী ছয় বৎসরের বালিকাকে তাহার মা সৎভাবে পালন করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র আশ্রমে দেয়। মা নিজের কোলের শিশুকে নামাইয়া রাখিয়া এই বালিকাটীকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। কত সময় রাত্রিকালে তাহার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছেন। আর এক সময় একটী ৯ দিনের শিশু আশ্রমে আসে। ছোট কোলের শিশুকে রাখিয়া মা তাহাকে স্তন্য দান করিতেন। একবার শিশুটীর রক্ত আমাশয় হইয়াছিল, মা অত্যন্ত অস্থির হইয়া, ব্যাকুল ভাবে তাহার শুশ্রূষা করিতেন। আর একবার শিশুটীর সর্ব্বশরীরে গলিত ক্ষত হইয়াছিল, মা স্বহস্তে অত্যন্ত যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করেন। আর একটী বালিকার এখানে আসিয়াই কলেরা হয়, মা তখন পূর্ণগর্ভাবস্থায় ছিলেন। তথাপিও নির্ভীক অন্তরে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ডাক্তার মহাশয় মার অবস্থা দেখিয়া সতর্ক করিলেন, কিন্তু মা অকাতরে সেবা করিতে লাগিলেন। আশ্রমের আর একটী কন্যা গর্ভাবস্থায় এখানে ছিল। তাহার প্রসব-বেদনা হইলে মা সমস্ত রাত্রি দিন অতি যত্নের সহিত তাহার সেবা করেন। তৎপরে একটী মৃত সন্তান প্রসূত হয়।

এইরূপে এক দিকে নিজের অপগণ্ড শিশু সন্তান, আবার নানারূপ প্রকৃতির বালিকা ও স্ত্রীলোককে লইয়া দশ বৎসরের অধিক কাল কত উদ্বেগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদের লালন পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। কখনও সদ্য-প্রসূত শিশু, কখনও বালিকা, কখনও বয়স্কা পতিতা স্ত্রীলোকগণ তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এইরূপে প্রায় ৫০টী বালিকাকে মা পালন করিয়া গিয়াছেন। যদি কখনও কোন বালিকা দুরবস্থায় কিংবা অভিভাবকহীন হইয়া রহিয়াছে শুনিতে পাইতেন, তবে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন এবং অনেক সময়ে নিজে গিয়া লইয়া আসিতে প্রস্তুত হইতেন। মা আপনার কন্যার ন্যায় ইহাদিগকে পালন করিতেন। সময় সময় উৎসবাদি উপলক্ষে আশ্রমস্থ বালিকাগণের নিমন্ত্রণ না হইলে আমাদেরও আহারাদিতে যোগ দিতে দিতেন না। বালিকাগণ নিমন্ত্রিত হইলেও তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে বসিবার বন্দোবস্ত হইত, তাহাদের মনে কষ্ট হইবে বলিয়া মা নিজে তাহাদের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতেন।

মা সময় সময় বালিকাদের জন্য কত অপমান সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু অনেক সময় তাহাদের নিকট হইতেই বিপরীত ব্যবহার পাইয়া বড় আঘাত পাইতেন। কিন্তু নিন্দা-প্রশংসা ও সুখ-দুঃখে বিচলিত না হইয়া ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সকলই সহ্য করিতেন।

জীবনের শেষ ভাগে মা একটী বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া গিয়াছেন। একটী বালিকা একাদশ কিংবা দ্বাদশ বৎসর বয়সে আশ্রমে আসে। মা তাহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পালন করিতে থাকেন। এই বালিকাকে মা স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যাতুল্য এমন কি আমা অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক স্নেহের সঙ্গে পালন করিতেন। দশ বৎসর কত যত্ন ও স্নেহ সহকারে তাহাকে পালন করিয়াছেন। মার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বালিকাটীর কোন গুরুতর ত্রুটী প্রকাশ পাওয়াতে সে আত্মহত্যার উদ্যোগ করে; সেজন্য তাহাকে লইয়া মা পূর্ণগর্ভাবস্থায় এবং নিজের অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিন চারি রাত্রি হাসপাতালে জাগরণ করেন। সে আরোগ্য লাভ করিলে মার অনভিমতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। মা সেই শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। এবং দেহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাহার জন্য মনের কষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই ঘটনার পর হইতে মার শরীর ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া আইসে। সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়েন। বাবা তখন গিরিধি ছিলেন। বাবা মার অসুখ শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, প্রসব কালে জীবন সংশয়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় দুই দিন পরে হঠাৎ ঈষৎ বেদনা অনুভব করিয়া অতি সহজে যমজ—একটী মৃত ও একটী জীবিত—পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। তৎপরে অত্যন্ত

দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু ভাবিলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় এ যাত্রা বুঝি রক্ষা পাইলেন। দুই তিন দিন পরে জ্বর হইতে লাগিল, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এইরূপে দিন দিন শ্রবণশক্তি, চিনিবার শক্তি এমন কি চৈতন্য লোপ পাইতে লাগিল ও মস্তিষ্কের বিকার আরম্ভ হইল। সুচিকিৎসার গুণে আবার একটু সুস্থতার দিকে আসিলেন। আবার জ্ঞান হইল, কথা বলিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু শ্রবণশক্তি খুব কমই রহিল। অন্য উপসর্গ প্রায় দূর হইল। কেবল অল্প অল্প জ্বর হইত। ভাতের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় ভাত দেওয়া হইল। আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু আবার অরুচি হইতে লাগিল ও ভিতরে ভিতরে নানা উপসর্গ আসিয়া তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল। আহার কমিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু হতাশ হইয়া পড়িলেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া কবিরাজ দেখান হইল। কবিরাজী চিকিৎসায় একটু ফল দর্শিল, জ্বর কমিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার জীবন-লীলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, ক্রমশঃ শরীরের তাপ কমিতে লাগিল। অবশেষে ১লা ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৯॥০ টার সময় মা সংসারের সকল দুঃখ এড়াইয়া শান্তিদায়িনী পরম-মাতার শান্তিক্রোড়ে চির শান্তি লাভ করিলেন।

শ্বাস উঠিবার পর পল্লীস্থ অনেকে দেখিতে আসেন। বাবা বলিলেন, কখন কি হইবে বলা যায় না, এখন আপনারা যান। সকলেই চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই জীবন শেষ হইল। সকলে অনুমান করিয়াছিলেন প্রাতঃকালে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। দেহত্যাগের পর বাবা ভাবিলেন, সমস্ত রাত্রি দেখিতেছি এই ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমাদের বলিলেন, "তোমরা সাহস করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি?" প্রথমতঃ সাহস হয় নাই, পরে আমি বলিলাম, ভগবান যখন আমাদের এরূপ নিরুপায় করিয়া ফেলিয়াছেন তখন একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। ভগবানের নিকট বল চাহিয়া মাকে লাল পেড়ে নব বস্ত্র পরিধান করাইলাম, ফুল চন্দন ও সিন্দুর দ্বারা বিভূষিত করিয়া প্রার্থনাদির পর আশ্রমস্থ দুই ভগ্নীর সহিত আমি ও বাবা লইয়া চলিলাম। ১২ টার সময় রওনা হইয়া ২॥০ টার সময় শ্মশানে পৌঁছিলাম। ঈশ্বর প্রাণে যে কি বল দিলেন এখন ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। স্বহস্তে মাকে চিতায় আরোহণ করাইলাম, স্বহস্তে অগ্নি সংযোগ করিলাম, প্রাণ পাষাণ হইয়া গেল। প্রার্থনা করিয়া ৭৷৮টার সময় বাড়ী ফিরিলাম।

মা রোগশয্যায় প্রায় ২॥ মাস পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে আমরা তাঁহাকে কত কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু কখনও তিক্ত বিরক্ত হন নাই। আমাদের স্নানাহারের দেরী হইলে ব্যস্ত হইয়া বার বার ত্বরা করিতে অনুরোধ করিতেন।

বাবা কখন কখন জিজ্ঞাসা করিতেন, 'মৃত্যুতে ভয় হয় কি?' তাহাতে মা বলিতেন, "না কিছুই ভয় হয় না, সেই ত শান্তির স্থান, পৃথিবী ত অসার।" কিছু বলিবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "কি বলিব! বলিবার কিছুই নাই।"

মা স্বভাবতঃ কয়েকটী গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। সরল ছিলেন বলিয়া যখন যাহা অন্যায় দেখিতেন, বলিয়া ফেলিতেন। এই জন্য অনেকের কাছে লাঞ্ছিত হইতেন ও অনেকে তাঁহাকে মুখরা ভাবিতেন। বিলাসিতা মার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত। কখনও কোন ভাল বস্ত্র পরিধান করিতেন না। আমার মাতুল মহাশয়ের বাড়ী হইতে যদি কখনও ভাল বস্ত্র পাইতেন তাহা আমাকে কিংবা আশ্রমস্থ বালিকাদিগকে পরিধান করিতে দেখিয়া সুখী হইতেন।

যদি কখনও কাহাকেও বিলাসিতা করিতে দেখিতেন, মা অমনি তাহাকে শাসন করিতেন, এই জন্য মা অনেক সময়ে কঠোরপ্রকৃতি বলিয়া পরিচিত হইতেন। আমাদিগকে যে বেশী রকম আদর করা, তাহা ছিল না। কিন্তু আমাদের আহার বিহার, সুস্থতা অসুস্থতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাবার শরীর অসুস্থ বলিয়া স্বহস্তে গম ভাঙ্গিয়া ময়দা প্রস্তুত করিয়া কত যত্নের সহিত রুটি করিয়া দিতেন।

ঋণকে মা বড় ভয় করিতেন। আশ্রমের এতগুলি